বেণীগীর ফুলবাড়ী

ভয়ানক বর্ষা। ক'দিন সমানভাবে চলিয়াছে, বিরাম বিশ্রাম নাই। প্রতুল মেসের বারান্দার নিজের সিটটিতে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় বা বাহির হইবে? যাইবার উপায় নাই কোনদিকে, ছাদ চুঁইয়া ঘরে জল পড়িতেছে—সকাল হইতে বিছানাটা একবার এদিকে, একবার ওদিকে সরাইয়াই বা কতক্ষণ পারা যায়? সন্ধ্যার সময় আরও জোর বর্ষা নামিল। চারিদিক ধোঁয়াকার হইয়া উঠিল, বৃষ্টির জলের কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে গ্যাসের আলোগুলো রাস্তার ধারে ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে।

প্রতুল একটা বিড়ি ধরাইল। সকাল হইতে এক বাণ্ডিল বিড়ি উঠিয়া গিয়াছে—বসিয়া বসিয়া বিড়ি খাওয়া ছাড়া সময় কাটাইবার উপায় কই? সিগারেট কিনিবার পয়সা নাই। এই সময়টা সিগারেট খাইয়া কাটাইতে হইলে দুই বাক্স ক্যাভেণ্ডার নেভিকাট সিগারেট লাগিত।

প্রতুলের হঠাৎ মনে পড়িল, এবেলা এখনও চা খাওয়া হয় নাই। মেসের চাকরকে ডাকিবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় দুয়ারে কে ঘা দিল। হয়তো হরিশ চাকরের মনে পড়িয়াছে তাহার ঘরে চা দেওয়া হয় নাই। দুয়ার খুলিয়া প্রতুল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—এই যে প্রতুলদা, ভাল আছেন? নমস্কার। এলাম আপনার এখানেই—

একটি ত্রিশ বত্রিশ বছরের লোক, গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের জুতা, হাতে একটা ছোট টিনের সুটকেস, সঙ্গে একটি বছর নয় দশের ছোট ছেলে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ছাতি হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছে—ভিজা জুতায় ঘরের দুয়ারের সামনের মেঝেটাতে জলে দাগ পড়িল, খোলা দরজা দিয়া ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

আয় রে খোকা, যা, গিয়ে বোস গে যা—তোর জ্যাঠামশায়, প্রণাম কর। দাঁড়া, পা-টা মুছে দিই গামছা দিয়ে—যা—

প্রতুল তখনও ঠিক করিতে পারে নাই লোকটা কে, এমন দুর্যোগের দিনে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। দেশের লোক, গ্রামের লোক তো নয়—কোথায় ইহাকে সে দেখিয়াছে? হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, এ সেই শশধর, নাথপুরের শশধর গাঙুলী। এত বড় হইয়া উঠিয়াছে সেই আঠারো উনিশ বছরের ছোকরা! আর বাল্যের সেই চমৎকার চেহারা এত খারাপ হইয়া উঠিল কিভাবে?

—চিনতে পেরেছেন প্রতুলদা?

—হ্যাঁ, এসো বসো, ও কতকাল পরে দেখা, তা তুমি জানলে কি করে এখানে আমি আছি? ভাল আছ বেশ? এটি কে—ছেলে? বেশ, বেশ।

শশধর রাঙ্গা দাঁত বাহির করিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল, তা হবে না? সে আজ কত বছরের কথা বলুন তো? আজ বারো তেরো কি চৌদ্দ বছরের কথা হয়ে গেল যে!

আপনার ঠিকানা নিলুম জীবন ভটচায্যির কাছ থেকে। জীবন ভটচাযকে মনে পড়ছে না? সেই যে জীবনদা, আমাদের লাইব্রেরীর সেক্রেটারী ছিল।

—কিন্তু জীবনবাবুই বা আমার ঠিকানা জানলেন কি করে—তাঁর সঙ্গেও তো বারো তেরো বছর দেখা নেই—যতদিন নাখপুর ছেড়েছি ততদিন তাঁর সঙ্গেও—

—জীবনদার শালার এক বন্ধু আপনারও বন্ধু—রাধিকাবাবু, চিনতে পেরেছেন এবার? সেখানে জীবনদা শুনেছে—আপনি তো আমাদের খবর রাখেন না—আমরা আপনার রাখি। এই, স্থির হয়ে বোস্ খোকা—এক কাপ চা খাওয়ান না দাদা, বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

সঙ্গের ছোট ছেলেটি অমনি বলিতে শুরু করিল, খিদে পেয়েচে, বাবা—আমার খিদে পেয়েছে।

তাহার বাবা ধমক দিয়া বলিল—থাম, ছোঁড়ার অমনি খিদে খিদে শুরু পেল, থাম না, খেইচিস্ তো দুপুরবেলা—

প্রতুল বলিল—আহা, ওকে ধমকাচ্চ কেন, ছেলেমানুষের খিদে তো পেতেই পারে! দাঁড়াও খোকা, আমি খাবার আনাচ্চি।

চা ও জলযোগের পর্ব্ব মিটিয়া গেলে প্রতুল বলিল—তারপর শশধর, এখন হচ্ছে কি?

শশধর বলিল—করবো আর কি! রামজীবনপুরের ইউ পি স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত। আজ দু দিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলাম, একটু কাজ আছে। ভাল কথা প্রতুলদা, এখানে একটু থাকবার জায়গা হবে?

প্রতুল বলিল—হাঁ হাঁ, তার আর কি। থাকো না। জায়গা তো যথেষ্টই রয়েচে। আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের খাওয়ার কথা রাত্রে।

আজ প্রায় বারো তেরো বছর আগে প্রতুল নাখপুর গ্রামের মিউনিসিপ্যাল অফিসে কেরাণীর চাকুরী লইয়া যায়। নাখপুর নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম নয়, আশপাশের চার-পাঁচখানি ছোট বড় গ্রাম লইয়া মিউনিসিপ্যালিটি—ইলেক্‌শন লইয়া দলাদলি মারামারি পর্য্যন্ত হইত, লাইব্রেরী ছিল, ডাক্তারখানা ছিল, হাই স্কুল ছিল, একটা পুলিশের ফাঁড়ি পর্য্যন্ত ছিল।

একদিন নিজের ক্ষুদ্র বাসাটিতে বসিয়া আছি একা, একটি আঠার উনিশ বছরের ছোকরা আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আপনি বুঝি নতুন এসেছেন আমাদের গাঁয়ে?

—হ্যাঁ। এসো বসো। তোমার নাম কি?

—আমার নাম শশধর। আপনার সাথে আলাপ করতে এলুম—একলাটি বসে থাকেন।

—এসো এসো, ভালই। তুমি স্কুলে পড় বুঝি?

শশধর পরিচয় দিল।

না, সে স্কুলে পড়ে না। অবস্থা ভাল না, স্কুলে কে পড়াইবে? তাহা ছাড়া সংসারে বাবা নাই, তাহারই ঘাড়ে সংসার। মা, দুই বোন, তিনটি ছোট ছোট ভাই, স্ত্রী।

প্রতুল বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি বিয়ে করেচ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওবছর বিয়ে হয়ে গিয়েচে।

ছেলেটি দেখিতে খুব সুশ্রী, সুপুরুষ। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াটা আশ্চর্য্য নয় বটে।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে ছেলেটি সেদিন চলিয়া গেল। তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে সে প্রায়ই আসিত। এ গ্রামে প্রতুল নতুন আসিয়াছে, বিশেষ কাহারও সহিত পরিচয় নাই, এ অবস্থায় একজন তরুণ বন্ধু লাভ করিয়া প্রতুলও খুশি হইল। সময় কাটাইবার একটা উপায় হইল। সন্ধ্যাবেলাটা দুজনে গল্পগুজবে কাটিয়া যাইত।

একদিন শশধর প্রতুলকে বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিল। শশধরের মা তাকে ছেলের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন, শশধরের বোন কণা তাকে প্রথম দিনেই 'প্রতুলদা' বলিয়া ডাকিল—এই নির্ব্বান্ধব পল্লীগ্রামে ইহাদের স্নেহসেবা প্রতুলের বড় ভাল লাগিল সেদিন।

ইহার পর অফিস হইতে প্রতুল নিজের বাসায় ফিরিতে না ফিরিতে শশধর প্রতুলকে ডাকিয়া নিজের বাড়ীতে প্রায়ই লইয়া যায়—প্রায়ই বৈকালিক চা-পানের ও জলযোগের ব্যবস্থা সেখানেই হইয়া থাকে।

দিনকতক যাইবার পরে প্রতুল ইহাতে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। শশধরদের সাংসারিক ব্যবস্থা বিশেষ সচ্ছল নয়, রোজ রোজ তাহার জলযোগের জন্য উহাদের খরচ করাইতে প্রতুলের মন সায় দিল না। সে খাওয়া বন্ধ করিল। অবশ্য মুখে সোজাসুজি কোন কিছু বলিতে পারা সম্ভব ছিল না—তবে যাইবার ইচ্ছা না থাকিলে ওজর আপত্তির অভাব হয় না।

একদিন শশধর আসিয়া বলিল—আজ যেতেই হবে প্রতুলদা—কণা বলেছে তোমাকে নিয়ে না গেলে সে ভয়ানক রাগ করবে আমার ওপর। প্রতুল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কণা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কণা—আমার ছোট বোন। ভুলে গেলেন নাকি? চলুন আজ। প্রতুলের মনে বিস্ময় এবং আনন্দ দুই-ই হইল। কণার বয়েস পনেরো ষোল—রং ফর্সা, বেশ সুশ্রী মেয়ে। কথাবার্ত্তা বলে চমৎকার—পাড়াগাঁয়ের তুলনায় লেখাপড়াও জানে ভাল। তাহার সম্বন্ধে কণা আগ্রহ দেখাইয়াছে কথাটা শুনিতে খুব ভাল।

কণা সেদিন প্রতুলের কাছে কাছেই রহিল। কয়দিন না দেখাশোনার পরে দুজনেরই দুজনকে যেন বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছে। ফিরিবার সময় প্রতুলের মনে হইল, কণাকে আজ যেন তাহার অত্যন্ত আপন জন বলিয়া মনে হইতেছে। কেন?

নির্জ্জন বাসায় ফিরিয়া কথাটা সে ভাবিল। কণা মেয়েটি ভাল, সত্যই বুদ্ধিমতী, সেবা-পরায়ণা। তাহাদেরই পালটি ঘর। আহা, এই জন্যই কি শশধরের এ তাগাদা—তাহাকে ঘন ঘন বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য?

কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও তাহার মনে না আসিয়া পারিল না, তাই কণার অত গায়ে পড়িয়া আলাপ করার ঝোঁক তার সঙ্গে!

প্রতুল আবার শশধরদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল।

শশধর আসিয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিতে আদৌ বিলম্ব করিল না। এবার কিন্তু প্রতুল

অত সহজে ভুলিল না। তাহার মনে দ্বন্দ্ব লাগিয়াছে। কণা তাহাকে সত্যই ভালবাসে, না তাহাকে বিবাহের ফাঁদে ফেলিবার জন্য ইহা তাহার একটি ছলনা মাত্র? কণার মা কিজন্য তাহাকে অত আদর করিয়া থাকেন বা শশধর তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে অত আগ্রহ দেখায়—ইহার কারণ প্রতুলের কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গরীবের মেয়ে, বিবাহ দিবার সঙ্গতি নাই উপযুক্ত পাত্রে—সে হিসাবে প্রতুল পাত্র ভালই, ত্রিশ টাকা মাহিনা পায় অফিসে, বয়স কম, দেখিতে শুনিতেও এ পর্য্যন্ত তো প্রতুলকে কেহ খারাপ বলে নাই।

ইহাদের সকল স্নেহ ভালবাসা বা আগ্রহের মধ্যে একটি গূঢ় স্বার্থসিদ্ধির সন্ধান জানিয়া প্রতুলের মন ইহাদের প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইয়া উঠিল।

মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে।

ভাদ্র মাস। সাত আট দিন বেশ ঝলমলে শরতের রৌদ্র—খালের ধারে কাশফুল ফুটিয়াছে, জল কাদা শুকাইয়া আসিতেছে। পূজার ছুটির আর বেশী দেরী নাই, প্রতুল বসিয়া বসিয়া সেই কথা ভাবিতেছিল—মিউনিসিপ্যাল অফিসে বার দিন ছুটি।

এই সময় একদিন কাহার মুখে প্রতুল শুনিল শশধরের বাড়ীতে বড় বিপদ। শশধরের মা মৃত্যুশয্যায়। শুনিয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শশধর এদিকে অনেক দিন আসে নাই তা নয়, প্রতুল উহাদের বাড়ী না গেলেও সে এখানে প্রায়ই আসিয়া বসিয়া থাকে, চা খায়, গল্পগুজব করে। কই, মায়ের এমন অসুখের কথা তো শশধর বলে নাই?

প্রতুল শশধরদের বাড়ী গেল। এমন বিপদের সময় না আসিয়া চুপ করিয়া থাকা—সেটা ভদ্রতা এবং মনুষ্যত্ব উভয়েরই বিরুদ্ধে। প্রতুলের কড়া নাড়ার শব্দে কণা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রতুলের মনে হইল কণা তাহাকে দরজায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। প্রতুলই আগে কথ কহিল। বলিল, মা কেমন আছেন?

—আসুন বাড়ীর মধ্যে। দাদা নেই বাড়ীতে. ডাক্তার ডাকতে গিয়েছে। অবস্থা ভাল না।

—চল, চল দেখি গিয়ে। আমি কিছুই জানিনে কণা অসুখের কথা, শশধর ক'দিন আমার ওখানে যায়নি। তবে মাঝে যা গিয়েছিল, তখন কিছু বলে নি।

—বলবে কি, মার অসুখ আজ সবে পাঁচ দিন হয়েচে তো। পরশু রাত্তির থেকে বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। এর আগে এমন তো হয় নি।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যেটা প্রতুলের চোখে সর্ব্বপ্রথম পড়িল, সেটি ইহাদের দারিদ্র্যের কুশ্রী ও মলিন রূপ। সে নিজেও বড়লোকের ছেলে নয়, কিন্তু তবুও তাহাদের বাড়ীতে গৃহস্থালীর যে শ্রীছাঁদ আছে, এখানে তার সিকিও নাই।

কণা বলিল, এতকাল আসেন নি কেন এদিকে? আমাদের তো ভুলেই গিয়েছেন।

প্রতুলের মনে কষ্ট হইল। কণার ক্লান্ত, উদ্বেগপূর্ণ এবং ঈষৎ বিষণ্ণ চোখ দুটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সে বড় নিষ্ঠুর কাজ করিয়াছে এতদিন এখানে না আসিয়া। কণা বড় ভাল মেয়ে, যতক্ষণ প্রতুল তাহাদের বাড়ী রহিল ততক্ষণের মধ্যেই প্রতুল জানিতে পারিল

কণার কি কর্ত্তব্যজ্ঞান, রুগ্ন মায়ের কি সেবাটাই করিতেছে কণা। এত দুঃখে উদ্বেগেও কণার সুন্দর রূপ ম্লান হয় নাই। অনেক মেয়েকে সে দেখিয়াছে—সাজিলে গুজিলে সুশ্রী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু মলিন কাপড় পরিয়া থাকিলে বা চুল না বাঁধা থাকিলে কিংবা হয়তো সদ্য ঘুম হইতে ওঠা অবস্থায় দেখিলে বড় খারাপ দেখায়।

কণার রূপের মধ্যে একটা কিছু আছে যাহাতে কোন অবস্থাতেই খারাপ দেখায় না। এত অনিয়ম, রাত্রি জাগরণ, উদ্বেগ, পরিশ্রমের মধ্যেও কণা তেমনই ফুটন্ত ফুলটির মত তাজা. তেমনই লাবণ্য ওর সুকুমার মুখে।

কণার সম্বন্ধে এই একটি মূল্যবান সত্য আবিষ্কার করিয়া প্রতুল আনন্দিত ও বিস্মিত দুই-ই হইল।

ইহার পর প্রতুল কয়দিনই কণাদের বাড়ী নিয়মিত যাইতে লাগিল—রোগিণীর সেবায় সেও কণাকে সাহায্য করিত— স্টোভ জ্বালা, জল গরম করা, বিছানার—চাদর বদলানোর সময় রোগিণীকে বিছানার একপাশে সরানো, ডালিম বেদানার দানা ছাড়ানো। পঞ্চম দিনের প্রাতঃকালে কণার মা যখন ইহলোকের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন তখন সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সে যথাযোগ্য সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, দাহকার্য্যের খরচপত্র নিজ হইতে দিল, কারণ শশধর একেবারে কপর্দ্দকশূন্য সেদিন। নিজে শ্মশানে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত রহিল। আবার সকলের সঙ্গে সেখান হইতে কণাদের বাড়ী ফিরিয়া আগুন তাপিল এবং নিমের পাতা দাঁতে কাটিল।

– কণা আজকাল প্রতুলের দিকেও বড় টানে, তাহার সুখ দুঃখ, সে রাত্রে ঘুমাইল কিনা, তাহাকে চা ঠিক সময়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে কিছু না হোক এক মুঠা মুড়ি ও তেল নুন মাখিয়া দেওয়া—এসব দিকে কণার সতর্ক দৃষ্টি—এত দুঃখ বিপদের মধ্যেও—ইহাও প্রতুলের মনে বড় আনন্দ দিয়াছে কয়দিন।

শ্রাদ্ধের আগের দিন প্রতুল শশধরকে নিজের মাহিনা হইতে কুড়িটি টাকা দিয়া তাহাকে কি করিতে হইবে না হইবে পরামর্শ দিল, জিনিসপত্র ও লোকজন খাওয়ানোর ফর্দ্দ ধরিল। সামান্য তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ হইবে—শ্রাদ্ধের দিন বারোটি ব্রাহ্মণ এবং নিয়মভঙ্গের দিন জন পনেরো জ্ঞাতি-কুটুম্ব খাইবে। এসব কথা কণাদের বাড়ী বসিয়াই হইতেছিল– পরামর্শান্তে প্রতুলকে বসাইয়া রাখিয়া শশধর কোথায় বাহির হইয়া গেল। প্রতুলের বসিয়া থাকিবার কারণ সে এখনও বৈকালিক চা পান করে নাই, না খাইয়া গেলে কণা চটিয়া যাইবে।

কণা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, প্রতুল কণার হাত হইতে পেয়ালাটি লইয়া বলিল—বসে কণা। কালকার সব যোগাড় করে রাখো—ফর্দ্দ দিয়েছেন নবীন ভটচায্যি। সন্ধ্যের পর একবার দেখে নিও সেখানা—শশধর কেনাকাটা করতে গিয়েছে, যদি কিছু বাদ পড়ে, আনিয়ে নিও।

—আপনি টাকা দিলেন?

—আমি? হাঁ—তা ইয়ে—

—কত টাকা দিলেন ?

—সে কথায় দরকার ? সে এমন কিছু নয়—তা ছাড়া ধার—শশধর আবার আমায়—

—দাদা আবার আপনাকে ছাই দেবে। আপনাকে কথাটা বলবো ভেবেছি। কেন আপনি আমাদের পেছনে এমন করে খরচ করবেন ? রোগের সময় টাকা দিয়েছেন—আবার কাজের সময় দেবেন ! আপনি কি এমন ন'শো পঞ্চাশ টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছেন শুনি ? মাইনে তো পান ত্রিশটি টাকা। আপনার নিজের বাবা মা ভাই-বোন রয়েছে, তাদের কি দেবেন ? নিজে কি খাবেন ? আপনাকে বলি শুনুন। দাদা বেকার বসে আছে, আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা কখনো আর উপুড় হাত করবে না। ওর ওই স্বভাব। আপনি আর এক পয়সা দেবেন না বলে দিচ্ছি। মায়ের কাজ হোক না হোক আপনার কি ? আপনি কেন দিতে যাবেন ?

প্রতুল বিস্মিত দৃষ্টিতে কণার মুখের দিকে চাহিল। কণার মুখে একটি সবল তেজস্বী সারল্য ...সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী ওর ডাগর চোখ দুটি, যা খোশামোদ করিতে বা ছলনা করিতে শেখে নাই আজও প্রতুলের মনে হইল।

কিন্তু কণা আজ এ কি নতুন ধরণের কথা বলিল ? ভারি আশ্চর্য্য কথা। এতদিন কণাকে চিনিতে পারে নাই সে, আজ চিনিল বটে। শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে প্রতুলের মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। কণা সাধারণ মেয়ে নয়।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়া গেল। প্রতুল নিয়মিত উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিতে লাগিল। কণার সেবা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, সে যত্ন ও সেবায় এতটুকু খুঁত কোনদিন প্রতুলের চোখে পড়িল না আজও। মায়ের শোক খানিকটা প্রশমিত হইবার পরে কণা আরও শ্রীময়ী হইয়া উঠিয়াছে এখন, পরিস্ফুট যৌবন-শ্রী তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

প্রতুল ইতিমধ্যে মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে কি করিয়া কথাটা এইবার সে পাড়িবে। কথাবার্ত্তা পাকা না হয় রহিল, অশৌচ কাটিয়া গেলে বিবাহ হইতে বাধা কি ! পরের বাড়ীর তরুণী পূর্ণযৌবন মেয়ের সহিত এ ভাবে মেলামেশা উচিত হইতেছে না—একটা পাকাপাকি কথা হওয়া ভালো। বৈকালে প্রতুল কণাদের বাড়ী গেল।

কণা আসিয়া বলিল, ওইরে বাস্ ! আমি বলেচি কি না বলেচি, প্রতুলদা তো এলো বলে ! দুধ নেই চা করবার, ওবেলা পিন্টু দুধের কড়া আল্‌গা করে দিয়েচে, আর সব দুধখানি উপুড় করে রেখে দিয়েচে বেড়ালে।

—বসো কণা এখানে। চা হবে এখন, তার জন্যে কিছু নয়।

কণা এখন মাতৃহীন ছোট ভাইবোনের মায়ের স্থান পূর্ণ করিয়া আছে, সংসারে সেই এখন কর্ত্রী, প্রতুল তা জানে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র কর্ত্রীটি মাঝে মাঝে কি রকমে ফাঁদে পড়িয়া যায় পয়সা কড়ির অভাবে তাহাও প্রতুল দেখিয়াছে। কণা তাহাকে কিছু বলে না—কোনদিন না —কিন্তু সে নানা রকমে টের পায়, যেমন আজই পাইল।

কণা কি কাজে একটু উঠিয়া গিয়াছে, প্রতুল কণার ছোট ভাই বিনুকে ডাকিয়া বলিল,

কি খেয়েচ খোকাবাবু ?

—ভাত খেয়েচি।

—এখন কি খেয়েচ ?

—আর কিছু নেই, ভাত নেই। দিদি খায় নি।

তখন সেখানে কণার ছোট বোন এগারো বছরের পিন্টু আসিল। প্রতুল বলিল, কণা খায় নি কেন ?

পিন্টু বলিল, ভাত ছিল না। ওবেলা চাল ধার করে নিয়ে এল দিদি ওই সরকারদের বাড়ী থেকে। দাদা কাল কোথায় গিয়েচে, আজও তো ফিরলো না। মহেশ চক্কত্তির দোকানে টাকা পাবে বলে চাল ডাল দেয় না আজকাল, দিদি এখন কোথায় পাবে, কোন্ দিকে যাবে ?

প্রতুল অনেক কথা ভাবিল। কণা সংসার চালাইতে পারে না টাকার অভাবে, সে নিজে যদি বাহির হইতে দু'দশ টাকা সাহায্য করে সেটা যেন ভিক্ষা দেওয়ার মত দেখায়। সে টাকা হাত পাতিয়া লওয়ায় কণার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। কণাকে সে-অপমানের মধ্যে টানিয়া আনিতে তাহার মন সরে না অথচ এ রকম কষ্ট করিয়াই বা কণা কতদিন বাঁচিবে ?

সবদিকের মীমাংসা করিতে হইলে বিবাহের কথাটা পাড়িতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আজই সে কণার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করিবে আগে—তাহার পরে শশধরকে জানাইলেই চলিবে এখন। শশধরটা মানুষ নয়, সে ইতিমধ্যে বেশ বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

কণা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল—একটু দেরী হয়ে গেল প্রতুলদা, দুধ ছিল না একেবারে। আনলাম রায় কাকাদের বাড়ী থেকে। দেখুন তো চা-টা খেয়ে কেমন হয়েচে ?

প্রতুল বলিল—ব্যস্ত হয়ে ঘুরচ কোথায় কণা ? বসো এখানে, কথা আছে।

শীতকালের বিকাল, কণাদের বাড়ীর চারিপাশে বনজঙ্গলে বনমৌরী লতায় ফুল ফুটিয়াছে—বেশ একটা উগ্র সুগন্ধে অপরাহ্নের শীতল বাতাস ভরপুর। ভাঙ্গা ইটের পাঁচিলের গায়ে রাঙা রোদ পড়িয়া কণাদের পুরানো পৈতৃক ভদ্রাসনের প্রাচীনত্ব ও দারিদ্র্য যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

কণা বলিল, প্রতুলের মুখের দিকে আগ্রহের সহিত চাহিয়া বলিল, কি প্রতুলদা ?

—তোমাকেই কথাটা বলি, কিছু মনে করো না কণা ! অনেকদিন থেকে কথাটা আমার মনে রয়েচে—বলি বলি করে বলা ঘটে উঠচে না। তুমি আমায় বিয়ে করবে কণা ? আমি অত্যন্ত সৌভাগ্য বলে মনে করবো, যদি—

কণা খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। খানিকক্ষণ দুজনের কেহই কথা বলিল না। তারপরে কণা ধীরে ধীরে অনেকটা চাপা সুরে বলিল, সে হয় না, প্রতুলদা।

প্রতুল বিস্মিত হইল। কণার এ উত্তর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত তাহার কাছে। বলিল, হয় না কণা?

কণা মাটির দিকে চোখ রাখিয়া পূর্ব্ববৎ নিয়স্বরে বলিল, হয় না প্রতুলদা। কারণ আছে অবিশ্যি। কিন্তু সে কথা বলবো না। বিয়ে হতে পারে না।

কেন? কণা কি অন্য কোন যুবককে ভালবাসে? কই, আর কোন যুবককে তো প্রতুল কোনদিন উহাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করিতে দেখে নাই? ব্যাপার কি?

—কারণটা জানতে পারলে বড় ভাল হতো, কণা। খুব বেশী বাধা কিছু আছে কি?

—হাঁ।

—কারণটা বলবে?

—আপনি কিছুই জানেন না? দাদা কিছু বলেনি আপনাকে?

প্রতুল আরও বিস্মিত হইল। কি জানিবে সে! শশধরই বা তাহাকে কি বলিবে! অত্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে সে বলিল—না কণা, তুমি কি বলচো আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে। শশধর কি বলবে আমায়?

—আমি বিধবা।

—তুমি!

—হাঁ, আট বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়—তেরো বছর বয়সে—এই পাঁচ বছর হলো।

প্রতুলের মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল যেন। সর্ব্বশরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। কণা বিধবা! কণার বিবাহ হইয়াছিল আট বছর বয়সে। অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস! আর সে কত আকাশ-কুসুম না রচনা করিয়াছে মনে মনে এই কণাকে লইয়া···ইহাদের প্রতি মনে মনে কত অবিচার করিয়াছে তাহাকে জামাই করিবার উদ্দেশ্য প্রতি-আরোপ করিয়া! গ্লানি ও অনুতাপে প্রতুলের মন পূর্ণ হইয়া গেল।

—কিন্তু কণা, একথা তো আমি কিছুই জানিনে। আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি।

—আমার কিন্তু ধারণা ছিল যে, আপনি জানেন, দাদা বলেছে আপনাকে। আমিও অবাক হয়ে গেছি এ কথা শুনে।

—একটা কথা বলবো! বিধবার পুনর্ব্বিবাহ তো হচ্ছে সমাজে।

—প্রতুলদা ওসব কথা থাক্। যা হয় না যেখানে, সেখানে সে কথা তোলা মিথ্যে মিথ্যে কেন?

—না, আমার কথার উত্তর দাও কণা, আমি অমন ধরনের কথা শুনবো না তোমার মুখে; তোমায় সুখী করার দিকে আমার লক্ষ্য। সেজন্যে সংস্কার এবং সমাজ আমি অনায়াসেই ঠেলবো।

কণার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে মুখ নীচু করিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—আপনার পায়ে পড়ি প্রতুলদা—

প্রতুল আর কিছু বলিল না। পরদিন অফিসে আসিয়াই সে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া দিল

এক মাসের নোটিশে। এখানে আর থাকিবে না, থাকিয়া লাভ নাই।

এই এক মাসের মধ্যে সে কণাদের বাড়ী গেল প্রায় প্রত্যেকদিনই কিন্তু চাকুরীতে নোটিশ দেওয়ার কথা কাহাকেও বলিল না। বিবাহ সম্বন্ধে কণার সাথে আর কোন কথাও সে বলে নাই যদিও কণা আগের মতই তাহার কাছে নিঃসঙ্কোচে আসে, বসে, কথাবার্ত্তা কয়।

যাইবার পূর্ব্বে সে কণাদের বাড়ী গেল। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সে বলিল, কণা, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি কাল।

কণা আশ্চর্য্য হইয়া প্রতুলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—চলে যাবেন? কেন?

—চাকুরী ছেড়ে দিচ্চি।

—সে কি কথা!

—কথা ঠিকই তাই। কাল যাচ্চি।

—সত্যি?

—সত্যি। মিথ্যে বলে লাভ কি?

—সেকথা তো একদিনও বলেন নি—

—না বলিনি। বলেই বা লাভ কি? যেতেই যখন হবে।

—কেন, এখানে আপনার অসুবিধা কি হচ্ছিল? ভাল চাকুরী পেয়েছেন বুঝি কোথাও?

—কোথাও না।

কণা চুপ করিয়া রহিল। প্রতুলও তাই।

খানিক পরে কণা বলিল, যাবেন তা জানতুম। বিদেশী লোক আপনি—আপনাকে তো ধরে রাখা যাবে না। আমাদের কথা আপনি শুনবেনই বা কেন?

—অনেক জ্বালাতন করেচি, কিছু মনে করো না কণা।

কণা চুপ করিয়া রহিল।

এই পর্য্যন্ত সেদিন কণার সঙ্গে কথাবার্ত্তা। পরদিন আর একবার কণাদের বাড়ী যাইবার কথা ভাবিয়াও প্রতুলের যাওয়া ঘটিল না, দুপুরের ট্রেনে প্রতুল চলিয়া আসিল।

সারাপথ কেবল কণার কথা মনে হইল প্রতুলের। সেই অভাব অনটনের সংসারে চিরকাল কাটাইতে হইবে তাহাকে। গরীবের ঘরের অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে, দাদার সংসার ছাড়া আর উপায় নাই। কণার জীবন অন্ধকার, কোন আলো নাই কোনদিক হইতে। প্রতুলের বুকের মধ্যে কোথায় যেন টন্‌টন্ করিতেছে। কণাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছে সে!

পরক্ষণেই ভাবিল, কি মুশকিল! কণা রয়েচে তার বাপের ভিটেতে ভাইবোনের কাছে, দাদার কাছে। আমার সঙ্গে তার কি?

মাস পাঁচ ছয় পরে, সেই ফাল্গুন মাসেই মায়ের পীড়াপীড়িতে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল।

প্রতুলের শ্বশুরের দু-তিনটি ছোট বড় কলিয়ারি ছিল। কিন্তু কলিয়ারিগুলির অবস্থা ছিল খারাপ। চুরি হইত, নির্ভরযোগ্য ম্যানেজারের অভাবে কলিয়ারিগুলি লোকসানী

মহল হইয়া পড়িয়া থাকিত।

প্রতুলের শ্বশুর একদিন প্রস্তাব করিলেন—সে অফিসে পরের চাকুরী না করিয়া যদি কলিয়ারিগুলির তত্ত্বাবধান করে, তবে অফিসে যে বেতন পাইতেছে তাহা তো পাইবেই, উপরন্তু ভবিষ্যতে একটা উন্নতির আশা থাকে শ্বশুর-জামাই উভয়েরই। প্রতুল শ্বশুরের প্রস্তাবে রাজী হইল। আরও বছর দুই পরে কলিয়ারির অবস্থা সত্যই ফিরিল প্রতুলের কর্মদক্ষতায়। প্রতুল আসানসোলের রেল স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে বুধচক্ কলিয়ারিতে সাজানো বাংলাতে স্ত্রীপুত্র (ইতিমধ্যে তাহার একটি ছেলে হইয়াছিল) লইয়া বাস করে—একটু স্টাইলের উপরই থাকে, না থাকিলে চলে না, কাজের খাতিরেই থাকিতে হয় নাকি।

কি জানি কেন এখানে আসিয়া কণার কথা তাহার বড়ই মনে পড়িতে লাগিল। আজ তাহার এই সাজানো বাংলো, সুখ ঐশ্বর্য্য—ইহাদের ভাগ কণা কিছুই পাইল না। সেই সুদূর পাড়াগাঁয়ে দারিদ্র্য ও নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে ভাঙা পুরোনো ইটের পুরোনো কোঠাবাড়ী আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল!

প্রতুলের মনটা যেন হা হা করিয়া ওঠে। সে বুঝিল, এখনও কণার কথা তাহার মন জুড়িয়া বসিয়া আছে, তাই তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া প্রতুলের পক্ষে সহজ নয়। প্রতুলের স্ত্রী বড়লোকের মেয়ে, বাল্যকাল হইতে সে সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নতুন জিনিস দেখাইয়া লাভ কি? তেলা মাথায় তেল দেওয়া। বরং যে চিরবঞ্চিতা —জীবন যাহাকে কিছু দেয় নাই—তাহাকে যদি আজ সে—কেন এমন হয় জীবনে কে বলিবে?

যে পাইয়া আসিতেছে সে-ই বরাবর পায়, যে পায় না সে কখনই পায় না। যাহাকে খাওয়াইয়া সুখ পরাইয়া সুখ, দেখিয়া দেখাইয়া সুখ—তাহাকে খাওয়ানো যায় না, পরানো যায় না, দেখানোও যায় না।

কেন এমন হয়?

এ সব চার পাঁচ বছর আগের কথা।

আজ কয়েক দিন হইল প্রতুল কলিকাতায় আসিয়াছে চাকুরীর খোঁজে।

কলিয়ারি আছে কিন্তু প্রতুলের স্ত্রী নাই। পুনর্মূষিকের পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইবার ইতিহাস আছে! সংক্ষেপে এই যে, গত বৎসর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই শ্বশুরের কলিয়ারিতে থাকা প্রতুলের ভাল মনে হইল না এবং তার পরে দেখা গেল প্রতুলের শ্বশুরেরও তাহা ক্রমশঃ ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না। সুতরাং আজ কয়েকদিন হইল প্রতুল তাহার ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া এই পরিচিত মেসটিতে উঠিয়াছে এবং চাকুরীর সন্ধানে আছে।

এই সেই শশধর। কণার ভাই। এতকাল পরে হঠাৎ এভাবে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ বসিয়া শশধর চা খাইয়া সুস্থ হইবার পরে প্রতুল বলিল,

গায়পরে কি মনে করে? কেমন আছ?

শশধর বলিল, ভালই আছি। আপনি এখানে আছেন তা শুনলুম জীবনদার কাছে। আপনি নাকি চাকুরী খুঁজচেন? সেই জন্যেই আমার এখানে আসা। আপনার সব কথাই শুনেছি।

কি ব্যাপার? চাকুরী সন্ধানে আছে নাকি?

আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যাল অফিসের সেই কেরাণীর পোস্ট খালি হয়েছে। আপনি গেলে ওরা লুফে নেবে এখুনি। কিশোরী চাটুয্যে এখন চেয়ারম্যান, আপনাকে বড় ভালবাসতো, আমাদের আপনার লোক। দিন একখানা দরখাস্ত করে। আমি লিখলে একবার গিয়ে ইণ্টারভিউ করে আসবেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে।

আবার সেই নাথপুর! সেই মিউনিসিপ্যাল অফিসের ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণীর পদ! তাহাই হউক। প্রতুল দরখাস্ত লিখিয়া পরদিন সকালে শশধরের হাতে দিল। চাকরী না করিলে চলিবে না। ছোট ছেলেটি লইয়া ত্রিশ টাকায় তাহার খুব চলিয়া যাইবে। তাহার বাবা মা জীবিত বটে, কিন্তু ছেলের রোজগারের উপর তাঁহাদের নির্ভর করিতে হয় না।

দিন পনেরো পরে শশধর লিখিল—চাকুরীর সব ঠিক, একবার আসিয়া চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করা দরকার। প্রতুল ছেলেকে লইয়া নাথপুরে গেল। দশ বৎসর আগে নাই এদিকে, অথচ যেন মনে হইতেছে কাল এ গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। কণার কথা সে শশধরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, কোথায় যেন বাধিয়াছিল—বহু চেষ্টা করিয়াও পারে নাই। আজ স্টেশনে নামিতেই কণার কথা প্রথমেই মনে পড়িল। কণা যেখানে থাকে, সেখানেই সে থাকিবে জীবনের বাকী কয়টা দিন।

বেলা প্রায় একটা, শশধর স্টেশনে ছিল। বলিল—প্রতুলদা, আপনার সেই পুরানো বাসা ভাড়া করে রেখেছি। কোন অসুবিধে হবে না। আর কণা বলে দিয়েছে আজ ওখানে খাবেন। চাকুরী হয়ে যাবে এখন, সব বলা আছে।

প্রতুল বলিল—এবেলা খাব না। খোকাকে বরং নিয়ে যাও কণার কাছে। আমি অফিসের পরে যাব। আমরা দুজনেই সকালে খেয়ে গাড়ীতে চড়েচি। বিকালের দিকে চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরে প্রতুল শশধরদের বাড়ী গেল। প্রথমেই কণা আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—প্রতুলদা,—এতদিন পরে মনে পড়লো? তারপর সে পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল।

প্রতুল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে কণা কোথায়? কোথায় সেই লাবণ্যময়ী কিশোরী? এ কণাকে সে চেনে না। কণা পূর্ব্বাপেক্ষা শীর্ণা হইয়াছে। যৌবনের সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে অনেককাল বলিয়াই মনে হয়—যদিও বর্ত্তমানে সাতাশ-আটাশ বছরের বেশী বয়স নয় কণার। মুখের কোথাও পূর্ব্ব লাবণ্যের চিহ্ন আছে কিনা প্রতুল বিশেষভাবে খুঁজিয়া দেখিয়াও পাইল না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতুল দেখিল কণার উপর তাহার সে ভালবাসা যেন এক মুহূর্ত্তে মন হইতে

কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। এ কথা অন্য একজন স্ত্রীলোকে—তাহার ভালবাসার পাত্রী, তাহার পরিচিত কথা এ নয়। কাহাকে সে ভালবাসিবে?

কথা অবশ্য খুব আদর-যত্ন করিল। আহারাদির পরে প্রতুলকে পান আনিয়া দিয়া কথা বলিল, কতদিন আসেন নি, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে প্রতুলদা। বসুন আমি আসচি।

প্রতুল ভাবিতেছিল, ভাগ্যে কথার সঙ্গে তাহার বিবাহের সুবিধা বা যোগাযোগ হয় নাই। কি বাঁচিয়াই গিয়াছে সে! ভগবান বাঁচাইয়া দিয়াছেন। উঃ!

দু-চারটি মামুলী কথা বলিয়া প্রতুল ছেলের হাত ধরিয়া উহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া যেন বাঁচিল।

পরদিন সকালে শশধরকে ডাকিয়া বলিল, না ভাই, ছেলেটার শরীর খারাপ হয়েছে কাল রাত্রেই। তোমাদের যা ম্যালেরিয়ার দেশ, ছেলে নিয়ে এখানে চাকুরী পোষাবে না। অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে।

মাস্টার মশায়

প্রশান্তবাবুর কথা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে।

সেদিন যেন কিসের ছুটি ছিল। বিকেলবেলা আমি ইস্টিশানের ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলুম। বিকেলবেলা আমি প্রায়ই ইস্টিশানে বেড়াতে যেতুম, বিশেষতঃ ছুটির দিনে। হিস্ হিস্ করে স্টীম ছাড়ে, খট্ খট্ করে গাড়ী চলতে থাকে, মাঝে মাঝে বিকট শব্দে সিটি দেয়। রেলের পুলের ওপর বসে আমার সেই সব দেখতে বেশ ভাল লাগত।

সন্ধ্যা হতে তখন অনেক দেরী আছে। পশ্চিম আকাশে লাল সূর্য্য যেন ফাগ ছড়িয়ে চারিদিক ভরিয়ে দিচ্ছে। কর্মব্যস্ত পৃথিবীর মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে নিঃশব্দতায় ধরিত্রী ভরে যাচ্ছে। আশেপাশের ঝোপঝাপ থেকে পাখীদের কিচির কিচির শব্দ ভেসে আসছে। আমি আঁকাবাঁকা মেঠো পথ বেয়ে পাকা কাঁঠালের তীব্র গন্ধে চিত্ত মদির করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

এমন সময় কলকাতা থেকে ট্রেনখানা এসে প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়াল। সে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সশব্দে হাঁফ ছাড়তে লাগল। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে তার বিশ্রাম নেবার অধিকার। এই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত কয়টির মধ্যে সকলের ওঠানামা শেষ করতে হবে। যথাসময়ে গাড়ী পুনরায় ছেড়ে দিল। সে ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে সরু ফালি লাইনের ওপর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধূম নির্গত করে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। তার পেছনের লাল আলোটা বহুক্ষণ ধরে দেখতে পেলুম। আম কাঁঠালের বাগানের ধার দিয়ে, বাঁশ ঝোপের পাশ দিয়ে, সবুজ ধান ক্ষেতের কোণ ধরে, পানের বাড় পেছনে ফেলে সশব্দে ট্রেন এগিয়ে গেল।

কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে একটি ভদ্রলোক ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে এলেন। বেশ সুপুরুষ চেহারা, বয়স বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, খুব ফর্সা, চোখে সোনার চশমা। গ্রামের মধ্যে কোথাও তাঁকে দেখেছি বলে মনে হয় না। অবাক হয়ে তাঁর পানে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলুম। আশ্চর্য্য! তিনি আমার কাছেই এগিয়ে এলেন, এমন কি তিনি আমাকেই প্রথমে সম্বোধন করলেন, শোন খোকা।

আমার চিত্ত পরম শ্রদ্ধায় ভয়ে গেল। বিনীত কণ্ঠে বললুম, আজ্ঞে!

তিনি বললেন, তুমি বুঝি এখানে থাক?

বললুম, হাঁ।

তিনি বললেন, বিষ্ণুপুর হাইস্কুল কোথায় বলতে পার?

বললুম, এই তো আমাদের স্কুল, চলুন না নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বললেন, ওঃ, তুমি বুঝি ওই স্কুলে পড়?

আমি গর্ব্ব অনুভব করলুম। তিনি বললেন, কোন্ ক্লাসে পড়?

বললুম, ক্লাস সেভেনে।

তিনি বললেন, বেশ বেশ, তোমার নাম?

বললুম, শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, গ্রামের মধ্যেই প্রায়। একটা মোড় বাঁকতেই স্কুল দেখা গেল। বললুম, ঐ দেখুন, আমাদের ইস্কুল……ঐ সাদা রঙের দোতলা বাড়ীটা। আপনি কোথায় যাবেন? ইস্কুল তো এখন বন্ধ।

তিনি বললেন, আমি যাব আশু চৌধুরীর বাড়ী।

আমি বললুম, ওঃ! আপনিই বুঝি আমাদের নতুন হেড্‌মাস্টার?

তিনি স্মিতমুখে বললেন, হাঁ, কেন বল তো?

আশ্চর্য্য! আমি এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলেছি? প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ. আমাদের নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। আমি নিবিড় শ্রদ্ধায় তাঁর পদধূলি মাথায় নিলুম। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, থাক্ থাক্ থাক্।

আজও আমি সেদিনের কথা ভুলতে পারি নি। তাঁর সেই সৌম্য মূর্ত্তি, মধুর ভাষা আমার স্মৃতিপটে ছুরপনেয় রেখাপাত করে গেছে।

স্কুলে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল। আগেকার বুড়ো হেড্‌মাস্টারের পরিবর্ত্তে প্রশান্ত-বাবুকে পেয়ে অনেকে স্বস্তি বোধ করল। উঁচু ক্লাসের বড় বড় ছেলেরা তো হেসেই ফুঁ করে উড়িয়ে দিল। বলল, আরে, ছ্যা। ও আবার হেডমাস্টারী করবে! ডিসিপ্লিন কাকে বলে তাই হয়তো জানে না। অতটুকু হেডমাস্টারকে কেই বা মানবে? কি বলিস্ বঙ্কেশ্বর?

বঙ্কেশ্বর তুড়ি দিয়ে বলল, আরে অমন অবনীবাবুকে ঘায়েল করে দিলাম তার আবার প্রশান্ত মুখুজ্জে এম. এ.! মাত্তর দুদিন, তারপর দেখে নিস, বাছাধনকে বুঝিয়ে দেব আমরা হচ্ছি ইস্কুলের লিডার। নে নে ভোলানাথ, একটা গান ধর।

নবীভক্ত ভোলানাথ বলল, ইস্কুলে বসে গান?

বক্তেশ্বর বলল, আরে গর্দভ, টিফিনের সময় গাইবি তো তাতে কি হয়েছে? নে সেই গানটা আরম্ভ কর, সেই 'ভুলি ভুলি করি ভুলিতে নারি'……

অগত্যা ভোলানাথ গলা ছেড়ে গান ধরল। গায়ক ভোলানাথের স্কুলে বেশ নাম° আছে। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছিলুম। সেখানে ঢোকবার হুকুম নেই কারণ সে হচ্ছে বড়দের আসর। গান বেশ তালে তালে চলতে লাগল। এমন সময় কোথা থেকে হেডমাস্টার মশাই সেখানে নিঃশব্দে এসে হাজির হলেন। কে যেন ভোলানাথের গলাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। লিডারদের মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেল। তাদের বীরত্ব আস্ফালন চিরতরে অন্তর্হিত হল। হেডমাস্টার মশায় ভোলানাথের কান ধরে দাঁড় করিয়ে তার দুগালে ঠাস্ ঠাস্ করে দুটো চড় মেরে বললেন, এটা বাগানবাড়ী নয়।

তারপর অন্যান্য শ্রোতাদের এক এক চড় মেরে তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমন নিঃশব্দে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। লিডারদের তখন রক্ত গরম হয়ে গেছে। কেউ বলল, সেক্রেটারীর কাছে অ্যাপ্লিকেশন করবে। কেউ বলল, মজা দেখাবে।

কিন্তু কারুর মজা দেখাতে কিংবা অ্যাপ্লিকেশন করতে সাহস হল না। পরন্তু সকলে একবাক্যে স্বীকার করল যে হেডমাস্টার মশাই ভারী রাশভারী এবং কড়া মেজাজের লোক। বাস্তবিক ইস্কুলের সকলেই তাঁকে রীতিমত সমীহ করে চলত।

অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামময় তাঁর সুনাম রটে গেল আদর্শ শিক্ষক হিসেবে। তাঁকে সকলে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে লাগল। তিনি ছিলেন ছাত্রদের সাহায্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। যে যখন যা প্রশ্ন করত তিনি তখনই তার উত্তর দিতেন। ছেলেদের মঙ্গলের জন্যে তিনি সব সময়ে উন্মুখ ছিলেন।

তাঁর মধ্যে কোথাও একটুকু গর্ব ছিল না। তাঁর মুখ কোনসময়ে হাস্যমধুর, কোনসময়ে বা গাম্ভীর্যে অটল-প্রায়। সেই যে কথা আছে না 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি', হেডমাস্টার মশায় ছিলেন ঠিক সেই রকম। ছেলেরা কোন অন্যায় করলে তিনি তখন কঠোর শাস্তি দিতেন, আবার ছেলেরা কোন ভাল কাজ করলে তিনি তাদের প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন।

মাস কয়েক পরে শুনলুম তাঁর নাকি বিয়ে, এমন কি আমারই কাকার মেয়ে উষার সঙ্গে। উষাকে দেখতে ছিল ফুটফুটে ফুলের মত। দুজনকে চমৎকার মানায়। হারাণ চক্কোত্তি বললেন, অমন সোনার টুকরো মাস্টারকে সংসারী না হলে কি মানায় মুখুজ্জে মশাই? আমরা থাকতে এমনি করে ভেসে ভেসে বেড়াবে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, কিন্তু বিয়ে যে করতে চাইছে না।

চক্কোত্তি বললেন, ক্ষ্যাপা। বিয়ে কর বল্লেই বুঝি ছেলেরা রাজী হয়? কলিকালে সব উল্টে গেছে। ওরা মুখে প্রথমে ওরকম বলে থাকে। তুমি দেখে নিও, ও বিয়ে করবে।

আরে দাদা, বিয়ে করতে কার না ইচ্ছে যায় ? দেখে নিও, চাটুজ্জের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবই দেব।

যথাসময়ে তাঁরা হেডমাস্টার মশায়ের কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লেন। কিন্তু হেডমাস্টার মশাই প্রথমে বিনীতভাবে তাঁদের প্রস্তাব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। অথচ গ্রামের লোকও কেউ সহজে ছাড়ল না। হেডমাস্টার মশাই বললেন, দেখুন আমার আত্মীয়স্বজন এখানে কেউ নেই। এখানে বাড়ী ঘর-দোরও নেই। আমি থাকি পরের বাড়ী। এখন আমার বিয়ে করা সাজে না।

রায়মশাই বললেন, বাড়ীর জন্যে ভাবতে হবে না মাস্টার মশাই। আমার একটা বাড়ী তো তো অমনি অমনি পড়ে রয়েছে। উঠবেন সেখানে গিয়ে।

হেডমাস্টার মশাই বল্লেন, আপনি আমায় নয় আজ থাকতে দিলেন, নয় ধরুন কাল থাকতে দিলেন ; কিন্তু চিরকাল কি আশ্রয় পাব ?

রায়মশাই বললেন, আশ্রয় দেওয়া কার সাধ্যি বলুন মাস্টার মশাই ? আপনি নয় এক কাজ করতে পারেন, মাসে মাসে কিছু ভাড়া দেবেন, তা হলেই হবে। যতদিন বাড়ী থাকবে, যতদিন আপনি এখানে থাকবেন ততদিন আপনি ওখানে বাস করবেন।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, শুধু তাই নয়। আমার বিয়ে দেবেই বা কারা ?

রায়মশাই বললেন, তার জন্যে ভাববেন না। আমার বাড়ীর মেয়েরা গিয়ে আপনার বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবে। আপনি কেবল সাত-পাক ঘুরে আসবেন, ব্যস্ ; মানে গরীবের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার দেওয়া।

অগত্যা মাস্টার মশাইকে বাধ্য হয়ে বিয়ের জন্য রাজী হতে হল। তিনি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে উষাকে দেখে এলেন। সেই প্রথম দেখাতেই তাঁদের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। তিনি উষাকে তাঁর নিজের হাতের নাম লেখা আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করে এলেন। বাড়ীর ভেতর থেকে শাঁখ বেজে উঠল। মেয়েরা উলু দিল।

হেডমাস্টার মশাই আমাদের ইংরিজি পড়াতেন। প্রথম দিন ক্লাসে এলেন গম্ভীরভাবে। ইস্টিশানের সেই প্রশান্তবাবু আর নেই। কারুর মুখে কোন কথা নেই। যেন নিঃশ্বাসের শব্দটুকু শোনা যায়। তিনি আমাদের একখানা বই নিয়ে বললেন, তোমাদের কি কি পদ্য পড়া হয়েছে ?

আমি বললুম, We are Seven, Luoy Gray, The blind boy .. ।

তিনি বললেন, We are Seven হয়েছে ? কার লেখা বল দিকি ?

সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর।

তিনি বললেন, একজন একজন করে উত্তর দাও। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে তোমরা কে কি জান ?

কারুর মুখে কোন কথা সরল না। তিনি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আচ্ছা তুমি বল দিকি ?

আমি বললুম, তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃতির প্রাণ আছে।

তিনি বললেন, বেশ, বেশ। বল তো এই জায়গাটার মানে কি?

"How many you are, then" said I
"If they two are in Heaven?"
Quick was the little maid's reply
"O Master! We are seven."

অনেকেই তার কথার মানে করে গেল। তিনি তখন বললেন, কেউ আর কিছু জান?

কেউ আর উত্তর করতে পারল না। আমি বললুম, ঐ মানে আমরা শিখেছি।

তিনি মৃদু হাসলেন, বললেন, তোমাদের মানে ঠিকই হয়েছে। ওর আর একটা বিশেষ অর্থ আছে।

আমরা সকলে অবাক হয়ে তাঁর পানে তাকিয়ে রইলুম। তখন তিনি আমাদের বললেন, আত্মার অমরত্বের কথা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে গেলুম। সে ব্যাখ্যা এখনও আমার বেশ মনে আছে। শেষে তিনি বললেন, তোমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় কে?

আমি উঠে দাঁড়ালুম, তিনি বললেন, ওঃ, তোমার সঙ্গেই না সেদিন দেখা হয়েছিল? তোমার নাম নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় না?

বললুম, হ্যাঁ।

এর পর তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব গভীর হয়ে উঠল। তিনি প্রায়ই আমায় ছুটির পর আপিস ঘরে নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর বই পড়তে দিতেন। যে জায়গাটা বুঝতে পারতুম না, সেটা কত রকমে কতবার বুঝিয়ে দিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'। এখন তোমরা শুধু পড়বে। পড়া মানে যে কেবল বইয়ের পড়া তা নয়। পড়া মানে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে পৃথিবীর চারদিক গভীরভাবে দেখা। জান, নিউটন কি করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন, কি করে গ্যাল্‌ভানি ইলেক্‌ট্রিসিটি আবিষ্কার করেছিলেন, স্নান করতে করতে আর্কিমেডিস্ হায়ড্রোস্ট্যাটিকসের কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন? আমাদের চারপাশে এমন অনেক জিনিস ঘটছে যা আমরা দেখছি শুধু সাদা চোখে, তার সেই পর্দা সরিয়ে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পাচ্ছি না। বড় হতে হলে চোখ চাই—সব জিনিস বুঝে দেখবার চোখ।

আমরা পরম বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনতুম। তিনি বলতেন, দেশ তোমাদের কাছে কিছু চায়। তোমরা দেশের কাছে বলিপ্রদত্ত। দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম।

যে মাস্টার মশায়ের বিয়ে করবার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না, আশীর্ব্বাদের পর তাঁর মধ্যে

নতুন উৎসাহ দেখা দিল। অজস্র পয়সা খরচ করে তিনি বিরাট আয়োজন করতে লাগলেন। সারা গ্রামে মহা ধুমধাম পড়ে গেল। আমাদের স্কুল চারদিনের জন্য বন্ধ হইল। কলকাতা থেকে গায়ে হলুদের আগের দিন জিনিসপত্র কিনে আনা হল। কনের জন্যে পঁয়তাল্লিশ টাকা দামের একখানা বেনারসী শাড়ী এল। বিখ্যাত জুয়েলারের দোকান থেকে গহনা এল। তারপর দূরান্তর কাঁপিয়ে সানাই বেজে উঠতে লাগল।

গায়ে হলুদ দেখে সকলে তো অবাক হয়ে গেল।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। পাশের গ্রামের হেমন্ত হাজরারা মোটর পাঠিয়ে দিয়েছে বর নিয়ে যাওয়া হবে বলে। সারাদিন ধরে ফুল দিয়ে সেই মোটর সাজান হচ্ছে। আমাদের মন আনন্দে ভরে গেছে। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে বসে আমরা তর্ক করছি বরযাত্রী বড় না কনেযাত্রী বড়—এমন সময়ে দেখি স্কুলের সেক্রেটারী মশাই একজন বেঁটেমত কালো ভদ্রলোককে নিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি আমায় বললেন, তোর বাবাকে ডেকে দে দিকি।

তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর এবং চিন্তাযুক্ত। আমি বাবাকে ডেকে দিলুম। সেক্রেটারী বললেন, শুনে যান গোষ্ঠবাবু, এই ভদ্রলোক কি বলছেন।

বাবা বললেন, কি কি!

সেক্রেটারী বললেন, এদিকে আসুন। সতীশবাবুর মুখেই ব্যাপারটা শুনবেন।

সতীশবাবু ওরফে সেই কালোমত ভদ্রলোকটির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁদের কাছে গেলেন। তাঁরা ফিস্ ফিস্ করে কি সব বললেন। বাবার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তখনই কাকাকে ডাকা হল। তিনি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বাড়ীর ভেতর মেয়েরা চীৎকার করে কেঁদে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক নিরানন্দে ভরে গেল—সারা গৃহে বিষণ্ণতার ছায়া। সেক্রেটারী মশায় যাবার সময় বলে গেলেন, একেই বলে কলিকাল। নইলে বলুন, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে না? আজকাল মানুষ চেনা দায়।

ইতিমধ্যে পাড়ার এ্যামেচার ড্রামেটিক ক্লাবের মেম্বররা এসে দারুণ হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। বলল, শাস্তি চাই। আমরা কি সব মরে গেছি? গাঁয়ের মধ্যে একজন এসে যে এই কেলেঙ্কারি করবে তা আমরা কখনই সহ্য করব না। আজ ওর হাড় গুঁড়িয়েই ছেড়ে দেবে।

সেক্রেটারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, না না, তোমাদের অত কিছু করতে হবে না ভদ্রলোকের যা অপমান হবার খুবই হয়েছে। গায়ে যদি মানুষের চামড়া থাকে তো বুঝতে পারবে। কালই সমস্ত কাজ বুঝে দূর করে দেব গাঁ থেকে। তোমরা এই গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে রক্ষা কর।

তাঁরা সকলে চলে গেলে শুনলুম, হেডমাস্টারকে নিয়েই নাকি এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি। তিনি নাকি বিধবার ছেলে। ঐ সতীশবাবু হচ্ছেন তাঁর কাকা। আমার কাকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এ সব ভাগ্য। তা নইলে অমন সোনার টুকরো ছেলের কিনা এই বিচ্ছিরি রোগ?

ঈশ্বর বহু কষ্টে বিয়ে হল সেই গোধূলি লগ্নেই এই গাঁয়ের মতি বাঁড়ুয্যের ছেলে কিরণের সঙ্গে। কিরণ তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। যাই হোক, বিয়েতে আমি আনন্দ পাই নি একটুও, এমন কি বিয়েও কখনও এমন বিষণ্ণতার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে আর তো আমি শুনি নি। কোন প্রকারে সাত পাক ঘুরে মালা বদল করা আর নিঃশব্দে খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ করা।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। চুপ করে বাড়ী বসে থাকতে আর ভাল লাগল না। আস্তে আস্তে ইস্টিশানের ধারে বেড়াতে গেলুম।

সন্ধ্যা হয়েছে। দূরের জিনিস ভাল রকম দেখা যায় না। একটা নারকেল গাছের মাথাটা কাঁপছে, তার পাশ দিয়ে উজ্জ্বল শুকতারাটি দেখা গেল। ইস্টিশানে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। গাড়ী আসছে। স্ল্যাগ তাউন করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিন হলে হয়তো ছুটে গিয়ে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখতুম···সেটা হয়তো খটাখট খটাখট করে চলে যেত; কিন্তু আজ আমার পা যেন উঠতে চাইছে না। ধীরে ধীরে আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে চলেছি এমন সময়ে দেখি হেডমাস্টার মশাই ঠিক আমার সামনে। তাঁর হাতে একটা সুট্‌কেশ, পেছনে চাকরের মাথায় অন্যান্য জিনিসপত্র। তিনি আমার কাছে এলেন, বললেন, এখানে কি করছ নির্মল? বাড়ী যাও, ঠাণ্ডা লাগবে।

তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। মনে হল এবার বুঝি তিনি কেঁদে ফেলবেন। আমি নিঃশব্দে তাঁর পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকালুম। তিনি আমার পিঠটা বার দুয়েক চাপড়ে সহাস্যে বললেন, বেশ...বেশ বেশ।

আমি অতিকষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তাঁর চোখ চকচক করছে যেন।

নিকটেই ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। তিনি ক্ষিপ্র পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। যাবার সময় বললেন, বেশীক্ষণ আর এখানে থেকো না, বিশ্রী হাওয়া দিচ্ছে।

মাত্র মিনিট কয়েক ট্রেনখানা থামল। তার মধ্যেই ওঠানামা শেষ হয়ে গেল। আবার সেই দুরন্ত ট্রেন হু হু করে ছুটে চলল। মাথার ওপর দিয়ে ডানার ঝটাপটি করতে করতে একটা পেঁচা উড়ে গেল। আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে কয়েকবিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল।

তিরোলের বালা

মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন।

গাড়ী ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এখনও ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে নি, এ নিয়ে গাড়ীর লোকজনের মধ্যে নানা রকম মতামত চলেছে।

মশাই বড়গেছে নেমে যাব প্রায় পাঁচ মাইল। চারটে বাজে—এখনও গাড়ী ছাড়বার

নামটি নেই—কখন বাড়ী পৌঁছব ভাবুন তো ?

—এদের কাণ্ডই এই রকম—আসুন না সবাই মিলে একটু কাগজে লেখালেখি করি। সেদিন বড়গেছে ইস্টিশানে দুটো ট্রেনের লোক এক ট্রেনে পুরলে—দাঁড়াবার পর্য্যন্ত জায়গা নেই—তাও কদমতলায় এল এক ঘণ্টা লেট্।

—ঐ আপিসের সময়টা একটু টাইমমত যায়—তার পর সব গাড়ীরই সমান দশা—

—আঃ, কি ভুল যে করেছি মশাই এই লাইনে বাড়ী করে। রিটায়ার করলাম, কোথায় বাড়ী করি, কোথায় বাড়ী করি, আমার শ্বশুর বললেন, তাঁর গ্রামে বাড়ী করতে—

—সে কোথায় মশাই ?

—এই প্রসাদপুর, যেখানে প্রসাদপুরের ঠাকুর আছেন, মেয়েদের ছেলেপুলে না হলে মাদুলি নিয়ে আসে, হাওড়া ময়দান থেকে পঁচিশ মাইল, বেশী না। ভাবলাম কলকাতার কাছে, সস্তাগণ্ডা হবে, পাড়াগাঁ জায়গা শ্বশুরবাড়ীর সবাই রয়েছেন—তখন কি মশাই জানি ? তিন-চার হাজার টাকা খরচ করে বাড়ী করলুম, দেখছি যেমনি ম্যালেরিয়া তেমনি যাতায়াতের কষ্ট, পঁচিশ মাইল আসতে পঁচিশ খেলা খেলছে। এই স্টুপিড গাড়ীগুলো—

—পঁচিশ কি স্যর, তিন পঁচিশং পঁচাত্তর খেলা বলুন ! আমারও পৈতৃক বাড়ী ঐ প্রসাদপুরের কাছে নরোত্তমপুর। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি, কান্না পায় এক-এক সময়—

আমি যাচ্ছিলাম চাঁপাডাঙ্গা। লাইনের শেষ স্টেশন। এদের কথাবার্ত্তা শুনে ভয় হলো। স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে দামোদর নদীর এপারেই আমার এক মাসীমা থাকেন, মেসো-মশায় নাকি মৃত্যুশয্যায়, তাই চিঠি পেয়ে মাসীমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সেখানে চলেছি। যে রকম এরা বলছে, তাতে কখন সেখানে পৌঁছব কে জানে ?

কামরার এক কোণের বেঞ্চিতে একটি যুবক ও তার সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে বসেছিল। মেয়েটির পরনে সিল্কের ছাপা-শাড়ী, পায়ে মাদ্রাজী চটি, মাথার চুলগুলো যেন একটু হেলাগোছা ভাবে বাঁধা—সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। যুবকটি মাঝে মাঝে সকলের কথাবার্ত্তা শুনছে, মাঝে মাঝে বাইরের দিকে চেয়ে ধূমপান করছে।

গাড়ী ছেড়ে তিন-চারটে স্টেশন এল। পান, পটল, আলু, মাছের পুঁটুলি হাতে ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল ক্রমে নেমে যাচ্ছে। বাকি দল এখনও সামনাসামনি বেঞ্চিতে মুখোমুখি বসে কোঁচার কাপড় মেলে তাস খেলছে। মাঝে মাঝে ওদের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে এঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ ভেদ করে—টু হার্টস্। নো ট্রাম্প ! থ্রি স্পেডস্ !

যখন জাঙ্গিপাড়া গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে তখন বেলা যায়-যায়। জাঙ্গিপাড়া স্টেশনের সামনে বড় দীঘিটার ধারের তালগাছগুলোর গায়ে রাঙা রোদ।

শেষ ডেলি প্যাসেঞ্জারটি জাঙ্গিপাড়ায় নেমে যাওয়াতে গাড়ী খালি হয়ে গেল—একেবারে খালি নয়, কারণ রইলাম কেবল আমি। কোণের বেঞ্চির দিকে চেয়ে দেখি সেই যুবক ও তার সঙ্গিনী মেয়েটিও রয়েছে।

এতক্ষণ ডেলি প্যাসেঞ্জারদের গল্পগুজব শুনতে শুনতে আসছিলাম বেশ, এখন তারা সবাই নেমে গিয়েছে, আমি প্রায় একাই—এখন স্বভাবতই যুবক ও মেয়েটির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। মেয়েটি বিবাহিতা নয়। সে তো বেশ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। তবে ওদের সম্বন্ধ কি ভাইবোন? কিংবা মামা-ভাগ্নী? মেয়েটি বেশ সুন্দরী। ছোকরা মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে না তো? আশ্চর্য্য নয়। আজকালকার ছেলেছোকরাদের কাণ্ড তো!

যাকগে, আমার সে-সব ভাবনার দরকার কি? নিজের কি হবে তার নেই ঠিক। সন্ধ্যা তো হয়ে এলো। মাসীমাদের গ্রাম স্টেশন থেকে দুই-তিন মাইল, পথও সুগম নয়। ট্রেন আঁটপুর এসে দাঁড়াল, জাঙ্গিপাড়ার পরের স্টেশন। তারপর ছাড়ল। বড় বড় ফাঁকা রাঢ়দেশের মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসছে, লাইনের ধারে ক্বচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষাগাঁ। লাউসতা চালে উঠেছে। একটা ছোট্ট গ্রাম্য হাট ভেঙে লোকজন ধামা-চেঙারি মাথায় ফিরছে—আবার মাঠ, জামগাছের মাথায় কালো কালো বাদুড় উড়ে এসে বসছে, খালের পারে মশাল জেলে জেলেরা মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

আবার সহযাত্রীদের দিকে চাইলাম।

দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। কিন্তু দুজনেই জানালার বাইরে চেয়ে রয়েছে। একটা কথাও শুনলাম না ওদের মধ্যে।

ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে পালাতে দু-জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে! বেশ সুন্দর চেহারা দুজনেরই। না, মামাভাগ্নী বা ভাইবোন নয়। নিয়ে পালানোই ঠিক। কিন্তু এদিকে কোথায় যাবে ওরা? মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন তো আর দুটো স্টেশন গিয়ে রাঢ়দেশের অজ পাড়াগাঁ আর দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে শেষ হয়েছে। এ দুটি শৌখীন পোশাক-পরা তরুণ-তরুণীর পক্ষে সে অঞ্চল নিতান্ত খাপছাড়া ও অনুপযোগী।

যাক গে, আমার কেন ও-সব ভাবনা?

পিয়ামাড়া স্টেশনের সিগন্যালের সবুজ আলো দেখা দিয়েছে। সামনে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, নিতান্ত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। রাঢ় দেশের মাঠের উপর দিয়ে রাস্তা, সঙ্গে ব্যাগে কিছু টাকাকড়ি আছে, শুনেছি হুগলী জেলার এদিকে চুরি-ডাকাতি নাকি অত্যন্ত বেশী। মেসোমশায়ের চিকিৎসার জন্যে মাসীমা কিছু টাকার দরকার বলে লিখেছিলেন। মা-ই টাকাটা দিয়েছে। ধনে প্রাণে না মারা পড়ি শেষকালে!

হঠাৎ আমার সহযাত্রী যুবকটি আমার দিকে চেয়ে বললে—চাঁপাডাঙা ইস্টিশান থেকে নদীটা কত দূরে বলতে পারেন স্যার?

—নদী প্রায় আধ মাইল।

—নৌকা পাওয়া যায় খেয়ার?

—এখন নদীতে জল কম। তবে নৌকাও বোধ হয় আছে।

যুবকটি আর কোন কথা না বলে আবার বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আমার অত্যন্ত

কৌতূহল হলো, একবার জিজ্ঞেস করে দেখি না ওরা কোথায় যাবে। কিন্তু ওদের দিক থেকে কথাবার্ত্তার ভরসা না পেয়ে চুপ করে রইলাম।

পিয়াসাড়া স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। বিশেষ কেউ নামল উঠল না, ছোট স্টেশন। যুবকটি আমায় জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, স্যার, ওপারে গাড়ী পাওয়া যায়?

আমি ওর দিকে চেয়ে বললাম—কি গাড়ীর কথা বলছেন?

—এই যে-কোন গাড়ী—মোটর-বাস কি ঘোড়ার গাড়ী।

লোকটা বলে কি! এই অজ পাড়াগাঁয়ে ওদের জন্যে মোটরের বন্দোবস্ত করে রাখবে কে বুঝতে পারলাম না। বললাম—না মশায়, যতদূর জানি ও-সব পাবেন না সেখানে। পাড়াগাঁ জায়গা, রাস্তা-ঘাট তো নেই।

এবারও ওদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অতি কষ্টে চেপে গেলাম।

কিন্তু যুবকটি পরমুহূর্ত্তেই আমার সে কৌতূহল মেটাবার পথ পরিষ্কার করে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—ওখান থেকে তিরোল কতদূর হবে জানেন স্যার?

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলুম।

—তিরোল যাবেন নাকি? সে তো অনেক দূর বলেই শুনেছি। আমিও এদেশে প্রায় নতুন, ঠিক বলতে পারব না—তবে পাঁচ-ছ ক্রোশের কম নয়।

যুবকের মুখে উদ্বেগ ও চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। আমার দিকে একটু এগিয়ে বসে বললে—যদি কিছু মনে না করেন স্যার, একটা কথা বলব?

তবে ইলোপমেণ্টই হবে। যা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তিরোলে কেন? সেখানে তো লোকে যায় অন্য উদ্দেশ্যে।

বললুম—হ্যাঁ, বলুন না—বলুন।

যুবকটি মেয়েটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললে—ওকেই নিয়ে যাচ্ছি তিরোলে। পাগলা কালীর বালা আনতে ওরই জন্যে—আমার বোন, কাল অমাবস্যা আছে, কাল বালা পরা নিয়ম—

বাধা দিয়ে বললাম—মেয়েটি কি—

—চুপ করে আছে এখন প্রায় দু-মাস, কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে, সামলে রাখা কঠিন। এত রাত যে হবে বুঝতে পারি নি, সবাই বলেছিল স্টেশন থেকে বেশী দূর নয়—

—আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

—অনেক দূর থেকে স্যার, ধানবাদের কাছে সয়লাডি কলিয়ারি—এ-দিকের খবর কিছুই জানি নে—লোক যেমন বলেছে তেমনি শুনেছি—কি করি এখন? ঐ মেয়ে সঙ্গে, বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, বড় বিপদে পড়ে গেলাম যে!

চুপ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলাম।

ছোকরা বিপদে পড়ে গিয়েছে বেশ। ওর কথা শোনার পর থেকে মেয়েটির দিকে চেয়ে

দেখছি, চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ধপধপে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, ঠোঁটের দুটি প্রান্ত উপরদিকে কেমন একটু বাঁকান, তাতে মুখশ্রী আরও কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে! অমন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এই বিদেশে রাত্রিকালে মাঠের মধ্য দিয়ে পাঁচ-ছ ক্রোশ রাস্তা গাড়ীভাড়া করে গেলেও বিপদ কাটল বলে মনে করবার কারণ নেই।

এক চাঁপাডাঙ্গাতে কোথাও থাকা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অপরিচিত লোকদের, বিশেষ করে যখন শুনবে যে মেয়েটি পাগল—তখন ওদের রাত্রে আশ্রয় দেবার মত উদারতা খুব কম মানুষেরই হবে।

যুবকটিকে বললাম—চাঁপাডাঙাতে কোন লোকের বাড়ী আশ্রয় নেবেন রাত্রে—তার চেষ্টা দেখব?

—না স্যার, ওকে অপরিচিত লোকের মধ্যে রাখতে পারব না, তা হলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠবে। আমি ছাড়া আর কারও কাছে ও থাবে না পর্য্যন্ত। যে-কোনও তুচ্ছ ব্যাপারে ও ভীষণ খেপে উঠতে পারে—সে-ভরসা করি নে স্যার—ওর সে মূর্ত্তি দেখলে আমি ওর দাদা, আমি পর্য্যন্ত দস্তুরমত ভয় পাই—সে না-দেখাই ভাল। ও অন্য মানুষ হয়ে যায় একেবারে—

চাঁপাডাঙা স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল।

রাত্রির অন্ধকার এখনও ঘন হয়ে নামে নি, তবে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রি, অনুমান করা যায়, কি ধরণের হবে আর একটু পরে।

চাঁপাডাঙা স্টেশনের কাছে লোকের বাড়ীঘর বেশী নেই। খানকতক বিচুলি-ছাওয়া ঘর, অধিকাংশ পান-বিড়ি, মুড়িমুড়কি কিংবা মুদিখানার দোকান। একটা সাইকেল-সারানোর দোকান। একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা, ডাক্তারখানার এক পাশে স্থানীয় ডাকঘর। একটা পুকুর, পুকুরের ওপারে দু-একখানা চাষাভুষো লোকের ঘর।

আমরা টিকিট দিয়ে সবাই স্টেশনের বাইরে এলাম। সামনেই দু-তিন-খানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী দেখে আমার দুর্ভাবনা অনেকটা কমে গেল, কিন্তু যখন তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম নদীর ধার পর্য্যন্তই তারা যায়, নদীর পার হবার উপায় নেই গরুর গাড়ীর—তখন আমি আমার সঙ্গীটিকে বললুম—কি করবেন, নয়ত ইস্টিশানেই থাকবেন রাতে?

—না স্যার, কাল অমাবস্যা, আমায় তিরোল পৌঁছতেই হবে কাল। এখানে থাকলে কাজ হবে না। আপনি আর একটু কষ্ট করুন, আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে যখন পেয়েছি, ছাড়তে পারব না। আপনি না দেখলে কোথায় যাই বলুন!

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম।

ওদিকে মেসোমশায়ের অসুখ, সেখানে পয়সা-কড়ি নিয়ে যত শীগ্‌গির হয় পৌঁছনো দরকার। এদিকে এই বিপন্ন যুবক ও তার বিকৃতমস্তিষ্কা তরুণী ভগিনী। ছেড়েই বা এদের দিই কি করে এই অন্ধকার রাত্রে? তা হয় না। সঙ্গে যেতেই হবে, মেসোমশায়ের অদৃষ্টে যা ঘটুক।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা কিন্তু ভরসা দিল। তিয়োলের বাঁধা রাস্তা, নদী পেরিয়ে গাড়ী পাওয়া যায়, পালকি পাওয়া যায় একটু খোঁজ করলেই, হরদম লোক যাচ্ছে সেখানে, আতঙ্কিত কিছু নেই—নদীর খেয়া থেকে বড় জোর দু-ঘণ্টার রাস্তা।

নদীর ধার পর্য্যন্ত একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ীতে আমরা তিন জন এলাম। সারা ট্রেনে মেয়েটি কথা বলে নি, অন্ততঃ আমি শুনি নি। ছইয়ের মধ্যে বসে সে প্রথম কথা কইল। যুবকটির দিকে চেয়ে বললে—দাদা, আমার শীত করছে—তোমার শীত করছে না?

সুন্দর গলার স্বর—যেন সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি সহানুভূতির চোখে তরুণীর দিকে চাইলাম, আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি কি অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছে!

বললাম—শীত করতে পারে, নদীর হাওয়া বইছে—সঙ্গে কিছু আছে গায়ে দেবার?

যুবকটি বললে—না, গায়ে দেবার কিছু ধরুন এ-বোশেখ মাসে তো আনি নি—বিছানার চাদরখানা পেতে গাড়ীতে বসে ছিলাম—ওখানা গায়ে দে—

মেয়েটি আবার বললে—কি নদী দাদা?

বেশ স্বাভাবিক সুরে সহজ ধরনের কথাবার্ত্তা।

আমিই বললাম—দামোদর।

মেয়েটি এবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বল্লভপুরে যে-দামোদর? আমি জানি, খুব বড় নদী—না দাদা? ছেলেবেলায় দেখেছি—

যুবকটি আমায় বললে—দামোদরের ধারে বল্লভপুর বলে গ্রাম, বর্দ্ধমান জেলায়, সেখানে আমার মামার বাড়ী কি না? পূর্ণিমা—মানে আমার এই বোন সেখানে দু-বার গিয়েছিল ছেলেবেলায়—তার পর—

খেয়ায় নদী পার হবার সময় পূর্ণিমা ওর দাদাকে বললে—ভয় করছে দাদা—ডুবে যাবে না তো? ও দাদা—নৌকো দুলছে যে—

—ডুবে যাবি কেন? চুপ করে বসে থাক—দুলছে তাই কি?

ওপারে গিয়ে আমরা দেখি গাড়ীঘোড়া তো দূরের কথা, একটা মানুষ পর্য্যন্ত নেই। খেয়ার মাঝি লোকটা ভাল, সে আমাদের অবস্থা দেখে বললে—দাঁড়ান বাবুমশাইরা, শামকুড়ের গোয়ালাপাড়ায় গরুর গাড়ী পাওয়া যায়—আমি ডেকে দিচ্ছি—আপনারা নৌকোতেই বসুন—

পূর্ণিমা বললে—দাদা, কিছু খাবে না? খাবার রয়েছে তো—

পরে আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনিও খান, খাবার অনেক আছে—

ওর দাদা বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দে না, ওঁকে দে—তুইও খা—কিছু তো খাস নি—পৌঁছতে কত রাত হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা একটা ছোট্ট পুঁটুলি খুলে আমাদের সবাইকে লুচি, পটলভাজা, আলুচচ্চড়ি ও মিহিদানা পরিবেশন করে দিলে।

বললে—দেখ তো দাদা, মিহিদানা খারাপ হয়ে যায় নি?

আমি বললাম—এ কোথাকার মিহিদানা?

পূর্ণিমা বললে—বর্দ্ধমান থেকে কেনা আসবার সময়। খারাপ হয় নি? দেখুন তো মুখে দিয়ে—

আজ যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, তখন ভাবি নি এমন একটি সন্ধ্যার কথা, ভাবি নি যে দামোদর নদীর উপর নৌকাতে বসে একটি অপরিচিত যুবক ও একটি অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে খাবার খাব এভাবে। কেমন একটি শান্ত পরিবেশ, যেন বাড়ীতে মা-বোনের মধ্যেই আছি—বড় ভাল লাগছিল এদের।

কিন্তু পরবর্ত্তী মর্ম্মন্তুদ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে ফেলে আজ যখন আবার সেই সন্ধ্যাটির কথা ও আমার সেই তরুণ সঙ্গীদের কথা এখন ভাবি—তখন মনে হয়, সেদিন তাদের সঙ্গে না-দেখা হওয়াই ভাল ছিল। একটা দুঃখজনক করুণ স্মৃতির হাত থেকে বাঁচা যেত তাহ'লে।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন সময় গরুর গাড়ী নিয়ে খেয়ার মাঝি ঘাটের ধারে দামোদরের বিস্তৃত বালির চরে এসে হাজির হ'ল। তিরোল যাবার ভাড়া ধার্য্য করে আমরা গাড়ীতে উঠে পড়লাম, খেয়ার মাঝিকে তার পরিশ্রমের জন্যে কিছু বকশিশ দেওয়াও বাদ গেল না।

গাড়োয়ান বললে—বাবু, ভুল হয়ে গিয়েছে—বাড়ী থেকে তামাকের টিনটা নেওয়া হয় নি—গাড়ী গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাই—বেশী দেরী হবে না বাবু—

শামকুণ্ড গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকল। আমবাগান, বাঁশবন, লোকের বাড়ীঘরের পেছন দিয়ে রাস্তা; ঘরের দাওয়ায় মেয়েরা রান্না করছে, তার পর আবার মাঠ, আখের ক্ষেত, পাটক্ষেত, মাঠের মধ্যে দিয়ে চওড়া সাদা রাস্তা আমাদের সামনে বহুদূর চলে গিয়েছে। রাঢ়দেশের মাঠ, বনজঙ্গল খুব কম, এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে দু-চারটে কলাগাছ ছাড়া।

পূর্ণিমা আমায় বললে—আপনার মাসীমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর হবে?

—সে তো এদিকে নয়—দামোদরের ও-পারে। স্টেশনের পূবদিকে প্রায় দু ক্রোশ দূরে—

—আপনাকে আমরা কষ্ট দিলাম তো!

—কি আর কষ্ট?··· আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে কাল আপনাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে মাসীমার বাড়ী গেলেই হবে—

পূর্ণিমা মুখে আঁচল দিয়ে ছেলেমানুষি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে হঠাৎ। বললে—কি আর কষ্ট? না? আমাদের কাজ শেষ হলে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে—হি-হি-হি—

ওর হাসির অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বাস ও সৌন্দর্য্য আমাকে বড় মুগ্ধ করলে, এমন হাসি কোন দিন আমি হাসতে দেখি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এ অপ্রকৃতিস্থের হাসি। স্থিরমস্তিষ্ক মেয়ে হলে এ ধরনের হাসত না, অন্ততঃ এ-জায়গায় ও এ-অবস্থায়।

হঠাৎ ওর দাদা অন্ধকারের মধ্যে আমার গা টিপলে।

ব্যাপার কি? আমার ভয় হ'ল। মেয়েটি ভাল অবস্থায় আছে তো? আমি কোন

কথা না বলে চুপ করে রইলাম। কি জানি মেয়েটির কেমন মেজাজ, কোন্ কথা তার মনে কি ভাবে সাড়া জাগাবে যখন জানি না তখন একদম কথা না বলাই নিরাপদ।

মনে মনে ভাবলাম, এমন সুন্দর মেয়ে কি খারাপ অদৃষ্ট নিয়েই এসেছিল পৃথিবীতে যে তার অমন সুন্দর প্রাণভরা হাসি, তাতে মনে আনন্দ না এনে আনে ভয় ?

গাড়ীতে কিছুক্ষণ কেউ কথা বললে না—সবাই চুপচাপ। মাঠ ভেঙে গরুর গাড়ী আপন মনে চলছে, বোধ হয় আমার একটু তন্দ্রাবেশ হয়ে থাকবে, হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে অন্ধকার, আমার মনে হ'ল সেই অন্ধকারের মধ্যে তরুণী এবং তার দাদার মধ্যে যেন একটা হাতাহাতি ব্যাপার চলছে।

তরুণীর মুখের কষ্টকর 'আঃ' শব্দ আমার কানে যেতেই আমি পেছন ফিরে চাইলাম ওদের দিকে, কারণ আমি বসেছি ছইয়ের সামনে, আর ওরা বসেছে গাড়ীর পেছন দিকটায়, সেদিকে বেশী অন্ধকার, কারণ ছইয়ের ও-দিকটা চাঁচের পর্দা আঁটা।

আমি কোন কথা বলবার পূর্ব্বেই যুবকটি চাপা উত্তেগের সুরে বললে—ধরুন, ওকে ধরুন, ও গাড়ী থেকে নেমে পড়তে চাইছে—

চাপা সুরে বলবার কারণ বোধ হয় গাড়ীর গাড়োয়ানের কানে কথাটা না যায়।

আমি হতভম্ব হয়ে মেয়েটির গায়ে কি করে হাত দেব ভাবছি, এমন সময় যুবকটি বেদনার্ত্ত কণ্ঠে 'উহু-হু-হু' বলে উঠল। পরক্ষণেই বললে—কামড়ে দিয়েছে হাত—ধরবেন না, ধরবেন না—

ততক্ষণ গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়ে ফেলেছে। আমাদের দিকে চেয়ে বললে—কি বাবু ? কি হয়েছে ?

গাড়োয়ানের কথার উত্তর দেবার সময় বা সুযোগ তখন আমার নেই। কারণ মেয়েটি আমায় ঠেলে বাইরের দিকে আসতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে।

ওর দাদা বললে—ওর চুল ধরুন—গায়ে হাত দেবেন না, কামড়ে দেবে—

কিন্তু আমি কোন কিছু বাধা দেবার পূর্ব্বেই মেয়েটি আমাকে ঠেলে গরুর গাড়ীর সামনের দিকে গিয়ে পৌঁছল এবং গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়ল।

হতভম্ব গাড়োয়ান গরুর কাঁধ থেকে জোয়াল নাবাবার পূর্ব্বেই আমি ও মেয়েটির দাদা দু-জনেই গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

মাঠের মধ্যে অন্ধকার তত নিবিড় নয়, কিন্তু মেয়েটির কোন পাত্তা কোন দিকে দেখা গেল না।

আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং বোধ হয় মেয়েটির দাদারও—

এই সময়ে কিন্তু আমাদের গাড়োয়ান যথেষ্ট সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিলে। সে ততক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে। তিরোলে যারা যায়, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ যে অপ্রকৃতিস্থ থাকবেই, এ তথ্য তাদের অজানা নয়, তবে আমাদের তিনজনের মধ্যে কে সেই লোক, এটাই বোধ হয় সে এতক্ষণে ঠাওর করতে পারে নি।

গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি বললে—বাবু শীগ্‌গির চলুন, কাছেই পাতিহালের খাল—সেদিকে উনি না যান, টিপকলের আলোটা জ্বালুন—

এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমরা, যে, যুবকের পকেটে টর্চ রয়েছে, সে-কথা দুজনের কারও মনে নেই।

সবাই ছুটলাম গাড়োয়ানের পিছু পিছু। প্রায় দু-রশি আন্দাজ পথ ছুটে যাবার পরে একটা সরু খালের ধারে পৌঁছলাম, তার দু-পাড়ে নিবিড় কবার ঝাড়। তন্ন তন্ন করে ঝোপঝাড়ের আড়ালে খুঁজে, চিৎকার করে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সব ব্যাপারটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে এতক্ষণে ভেবে দেখবারও অবকাশ পাওয়া যায় নি জিনিসটার গুরুত্ব কতটা বা এ থেকে কত কি ঘটতে পারে।

পূর্ণিমার দাদা প্রায় কাঁদ-কাঁদ সুরে বললে—আর কোন দিকে কোন জলা আছে—হ্যাঁ গাড়োয়ান?

—না, বাবু, কাছেপিঠে আর জলা নেই তবে খালের ধারে আপনাদের মধ্যে এক জন দাঁড়িয়ে থাকুন, আমরা বাকি দু-জন অন্য দিকে যাই—

আমিই খালের ধারে রইলাম, কারণ যুবকটি একলা অন্ধকারে, যতদূর বুঝলাম, দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয়।

ওরা তো চলে গেল অন্য দিকে। আমার মুশকিল এই যে সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই। এই কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রের অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কি জানি?

সেখানে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, ঘণ্টাখানেক বোধ হয় হবে, তার বেশীও হয়ত! তারপর খালের ধার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলাম। এদের ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি নে।

এমন সময় দূরে আলো দেখা গেল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গলাটা শুনলাম—বাবু, বাবু—

আমার সাড়া পেয়ে ওরা আমার কাছে এল। গাড়োয়ানের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম্য লোক—ওদের হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন।

ব্যস্তভাবে বললাম—কি হ'ল? পাওয়া গিয়েছে?

যার হাতে লণ্ঠন ছিল, সে-লোকটা বললে—চলেন বাবু। সব রয়েছেন তেনারা আমার বাড়ীতে বসে। আমি বাবু গোয়ালঘরে গরুদের জাব কেটে দিতে ঢুকেছি সন্ধের একটু পরেই—দেখি গোয়ালঘরের এক পাশে একটি পরমাসুন্দরী ইস্ত্রিলোক। তখন আমি তো চমকে উঠেছি বাবু! ইকি! তারপর বাড়ীর লোক এসে পড়ল। তারপর এনারা গিয়ে পড়লেন। তাঁদের আমরা বাড়ীতে বসিয়ে আপনার খোঁজে বেরুলাম। অন্ধকারের মধ্যে ভদ্দরলোকের ছেলের একি কষ্ট! চলুন গরীবের বাড়ী। দুটো ভাল-ভাত রান্না করে খান।

দিদিঠাকরুণের মাথাটা তাল যদি হ'ত একটু তো দিদিঠাকরুণ একেবারে লক্ষ্মীর পিরতিমে। আমাদের বাড়ীতে তাঁর পায়ের ধুলো পড়েছে—আপনারা সবাই ব্রাহ্মণ শোনলাম—কতকালের ভাগ্যি আমাদের। দুটো ভাত সেবা করে আজ রাতে শুয়ে থাকুন—কাল ভোরে আমি আমার গাড়ীতে তিরোল পৌঁছে দেব আপনাদের। অমন হয়।

গ্রামের মধ্যে লোকটার বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম।

বাড়ীটার কথা এখানে একটু ভাল ক'রে বর্ণনা করা দরকার। কারণ এর পরবর্ত্তী ঘটনার সঙ্গে এই বাড়ীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক-এক বার ভাবি সে-রাত্রে যদি সেখানে থাকবার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওদের নিয়ে সোজাসুজি তিরোল চলে যেতুম!

আসলে নিয়তি। নিয়তি যাকে যেখানে টানে। তিরোল গেলেই কি নিয়তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত? ভুল।

বাড়ীটা ও-দেশের চলন-মত মাটির দেওয়াল, বিচুলিতে ছাওয়া। বাইরে বেশ বড় একখানা বৈঠকখানা, তার দুই কামরা মাটির দেওয়ালের ব্যবধান। সামনে খুব বড় মাটির দাওয়া, তার সামনে উঠান—উঠানের পশ্চিম ধারে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। বৈঠকখানার দুটো কামরার মধ্যে যেটা ছোট, সেটার পেছনের দোর খুলে কিন্তু বাইরের উঠানে আসা যায় না—সেটি অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথ।

গৃহস্বামীর নাম রসিকলাল ধাড়া জাতিতে কৈবর্ত্ত। সুতরাং তাদের রাঁধা ভাত আমাদের চলবে না। রসিকলালের একান্ত অনুরোধে আমরা রান্না করতে রাজি হলাম। জিনিসপত্র, দুধ, শাকসব্জী দু'জনের উপযোগী এসে পড়ল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রান্না করলে পূর্ণিমা। পূর্ণিমা আবার সেই আগেকার শান্ত, স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধরেছে। তার কথাবার্ত্তা, রান্নার কৌশল, সহজ ব্যবহার দেখে কেউ বলতেও পারবে না কিছুক্ষণ আগে এ পাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল।

খেতে বসবার কিছু আগে পূর্ণিমা যেখানে রাঁধছে, সেখানে উঁকি মেরে দেখি গ্রামের অনেক মেয়ে ওকে দেখতে এসেছে, নানারকম কথাবার্ত্তা জিগ্যেস করছে, বুঝলাম পূর্ণিমার কাহিনী গ্রামময় রটে গিয়েছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে, পূর্ণিমা এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল খেতে।

আমি বল্লাম- সকলের সঙ্গে আলাপ হ'ল পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা সলজ্জ হেসে বললে—ওরা সব এসেছে কেন জানেন, না কি আমায় সবাই দেখতে এসেছে। আমি বললাম, আমি ভাই আপনাদের মতই মেয়ে, দুখানা হাত, দুখানা পা, আমায় দেখবার কি আছে?

ওর দাদা বললে—আর কি কথা হ'ল?

—আর কিছু না। আমাদের বাড়ী কোথায়, আমার বয়স কত—এই জিগ্যেস করছিল।

তার পর বেশ দিব্যি সহজভাবেই বললে—আর বলছিল তোমার বিয়ে হয় নি? আমি

বললাম, এ-বছর আমার বিয়ে দেবেন বলেছেন বাবা!

বলেই সে আমাদের পাতে ডাল না কি পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে।

আমি তো অবাক, ওর দাদার দিকে চাইতে সে বেচারী আমায় চোখ টিপলে। পাগল হোক, উন্মাদ হোক, মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাবে কোথায়? বড় কষ্ট হ'ল ভেবে, অভাগীর ও-সাধ এ-জীবনে পূর্ণ হবার নয়।

কিন্তু এ ধরনের দু'একটা বেফাঁস কথা ছাড়া পূর্ণিমার অন্য সব কথাবার্তা এমন স্বাভাবিক যে, কেউ তার মধ্যে এতটুকু খুঁত ধরতে পারবে না। ওর গলার সুরটা ভারি মিষ্টি—খুব কম মেয়ের গলায় এমন মিষ্টি সুর শুনেছি। এমন একটি সুন্দর চালচলন, নিজের দেহটা বহন করে নিয়ে বেড়ানোর সুশ্রী ধরন আছে ওর যে ওকে নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে বলে কেউ ভাবতে পারবে না।

আমায় বললে আপনাকে আমরা তো বড় কষ্ট দিলুম। আমাদের সয়লাডিতে যাবেন কিন্তু একবার দাদা—

— বেশ, যাব বইকি দিদি, নিশ্চয়ই যাব—

- এই পূজার সময়েই যাবেন। আমাদের ওখানে দুখানা পূজো হয়, একখানা কলিয়ারীর বাবুরা করে আর একখানা বাজারে হয়। শখের থিয়েটার হয়,—

ওর দাদা এই সময় বললে—আর একটা জিনিস দেখবেন—সাঁওতালের নাচ, সে একটা দেখবার জিনিস, আসুন পূজার সময়--ভারী খুশী হব আমরা আপনি এলে।

পূর্ণিমা উৎসাহের সঙ্গে বললে—তা হলে কথা রইল কিন্তু দাদা। বোনের নেমন্তন্ন রাখতেই হবে আপনার—

এই সময় গৃহস্বামীর মেয়ে দুধ নিয়ে এসে পূর্ণিমাকে বললে আমাদের সকলকে দুধ দিতে।

পূর্ণিমা বললে- ত হলে একখানা দুধের হাতা নিয়ে এস খুকী--ডালের হাতায় তো দুধ দেওয়া যাবে না।

পূর্ণিমার এই সমস্ত কথাবার্তার খুঁটিনাটি আমার খুব মনে আছে, কারণ পরে এই কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল।

আহারাদির প্রায় আধ ঘণ্টা পর আমরা সবাই শুয়ে পড়লুম—পূর্ণিমা তার দাদার সঙ্গে বাইরের ঘরের ছোট কামরাটায় এবং আমি বড় কামরাটায়।

এবার আমি নিজের কথা বলি। শরীর ও মন বড় ক্লান্ত ছিল—অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ পরে জানি নে এবং কেন তাও জানি নে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার বুকে যেন পাথরের ভারি বোঝা চাপিয়েছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। ভাবলুম, নিশ্চয়ই নদীর হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে কিংবা ওই রকম কিছু। অমন হয়। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করি এমন সময় আমার মনে হ'ল পাশের কামরায় কি রকম একটা কৌতূহলজনক শব্দ হচ্ছে। হয়তো পূর্ণিমার দাদার নাক-ডাকার শব্দ অদ্ভুত রকমের নাক ডাকা বটে—যেন গোঙানি বা কাৎরানির শব্দের মত। একটু পরেই আর শব্দ

জানতে পেলুম না—আমিও পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

পাশের কামরায় দোর তখনও বন্ধ। আমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলুম। আধ ঘণ্টা বেড়ানোর পরে ফিরে এসে দেখি তখনও ওরা কেউ ওঠে নি—এমন কি বাড়ীর লোকও না। আরও আধ ঘণ্টা পরে গৃহস্বামী রসিক ধাড়া উঠে বাইরের ঘরের দাওয়ায় এসে বসল। আমায় বললে—ঘুমুলেন কেমন বাবু? মশা কামড়ায় নি? এঁরা এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি?

রসিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ চাষবাসের গল্প করলাম। তার পরে সে উঠে কোথাও বেরিয়ে গেল।

এদিকে প্রায় আটটা বাজল। তখনও পূর্ণিমা বা তার দাদার ঘুম ভাঙে নি। সাড়ে আটটার সময় রসিক ফিরে এল। গ্রীষ্মকাল, সাড়ে আটটা দস্তুরমত বেলা, খুব রোদ উঠে গিয়েছে চারিধারে। রসিক আবার জিগ্যেস করলে এরা এখনও ওঠেন নি? আমি বললাম—কই না, ওঠে নি তো। গরমে সারারাত ঘুম হয় নি বোধ হয়, ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে আর কি।

আমার কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। বেলা ন-টার সময়ও যখন ওদের সাড়া-শব্দ শোনা গেল না তখন আমি দরজায় ঘা দিলাম। ঘরের মধ্যে মানুষ আছে বলেই মনে হলো না। তখন বাধ্য হয়ে আমি পশ্চিম দিকের ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম—ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে নিদ্রিতা, এ অবস্থায় জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতে দ্বিধা বোধ করছিলাম কিন্তু একবার দেখাটা দরকার। ব্যাপার কি ওদের?

জানালা দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম বোধ হয়, ঠিক বলতে পারি নে। কারণ আমারও কিছুক্ষণের জন্যে বুঝি লোপ পেয়েছিল, কি যে ঘটেছে, কি না ঘটেছে আমার খেয়াল ছিল না।

জানালা দিয়ে যা দেখলুম তা এই।

প্রথমেই আমার চোখে পড়ল ঘরে এত রক্ত কেন? চোখে ভুল দেখলাম না কি? কিন্তু পরমুহূর্তেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। ঘরে একখানা চৌকি পাত, পূর্ণিমার দাদা চৌকির উপরকার বিছানায় উপুড় হয়ে কেমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে, বিছানা রক্তে ভাসছে, মেঝেতে রক্ত গড়িয়ে পড়ে মেঝে ভাসছে—আর পূর্ণিমা দেওয়ালের ধারে মেঝের ওপর পড়ে আছে, জীবিতা কি মৃতা বুঝতে পারলাম না। একটা পাশবালিশ চৌকির ওপর থেকে যেন ছিটকে পূর্ণিমার দেহের কাছে পড়ে, সেটাও রক্তমাখা।

আমার চীৎকার অনেক দূর থেকে শোনা গিয়েছিল নাকি। লোকজন চারিধার থেকে এসে পড়ল। আমার জ্ঞান ছিল না, মাথায় জলটল দিয়ে আমায় সকলে চাঙ্গা করে দশ-পনেরো মিনিট পরে।

এদিকে দরজা ভেঙে সকলে ঘরে ঢুকল। তারা দেখলে পূর্ণিমার দাদার গলায়, কাঁধে ও

হাতে সাংঘাতিক কোপের দাগ, আগের রাত্রে কুটনো কোটার জন্যে একখানা বড় বঁটি গৃহস্থেরা দিয়েছিল—সেখানা রক্তমাখা অবস্থায় বিছানার ওপাশে পড়ে, পূর্ণিমার শাড়ী ব্লাউজে কিন্তু খুব বেশী রক্ত নেই, কেবল শাড়ীর সামনের দিকটাতে যেন ছিটকে-লাগা রক্ত খানিকটা। হতভাগিনী রাত্রে কোন সময় এই বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়েছে, নিজের হাতে ভাইকে খুন করে ঘরের মেঝেতে অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। দিব্যি শান্ত, নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমুচ্ছে, আমার যখন জ্ঞান হয়ে ঘরে ঢুকেছি তখনও। ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখাচ্ছে কি সুন্দর, আরও ছেলেমানুষ, নিষ্পাপ সরলা বালিকার মত।

নারীর প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসমূর্তি সেই ভয়ানক প্রভাতে এক মুহূর্তে আমার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো—পলকে যে প্রলয় ঘটায়, এক হাতে দেয় প্রেম, অন্য হাতে আনে মৃত্যু, এক হাতে যার খড়্গ, অন্য হাতে বরাভয়।

অতঃপর যা ঘটবার তাই ঘটল। পাড়ার লোক, গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। পুলিশ এল - আমি মেয়েটির অবস্থা সম্বন্ধে যা জানি খুলে বললাম। তাদের জেরার প্রশ্নোত্তর দিতে দিতে আমার মনে হ'ল হয়তো বা আমিই পূর্ণিমার দাদাকে খুন করে থাকব। ঘুমন্ত মেয়েটির পাশ থেকে ওর দাদার মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা আমিই করে দিলাম—মৃতের সকল চিহ্ন, রক্তাক্ত বস্ত্র, বঁটি, বিছান। উন্মত্ততার ঘুম সহজে ভাঙে নি তাই রক্ষে—দুপুর পর্য্যন্ত পূর্ণিমা নিরুদ্বেগে ঘুমল। পুলিশকেও কষ্ট করে ওর ঘুম ভাঙাতে হলো।

আমি ওর পাশে দাঁড়ালুম এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে। অসহায় উন্মাদিনীর আর কে ছিল সেখানে? যদিও ওর অবস্থা দেখে চোখের জল ফেলে নি এমন লোক সে-অঞ্চলে ছিল না, কি মেয়ে কি পুরুষ—এমন কি থানার মুসলমান দারোগাবাবু পর্য্যন্ত।...

সয়লাভি কলিয়ারীতে টেলিগ্রাম করা হলো। ওর বাবা এলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর তিনটি বন্ধু। ওঁদের মুখে প্রথমে শুনলুম, পূর্ণিমা বিবাহিতা। পাগল বলে স্বামী নেয় না—সে কখনও জানে সে বিবাহিতা, কখনও আবার ভুলে যায়। পূর্ণিমার মা নেই তাও এই প্রথম শুনলাম।

ভদ্রবংশের ব্যাপার, এ নিয়ে খুব গোলমাল যাতে না হয়, শুরু থেকেই তার ব্যবস্থা করা হলো। খবরের কাগজে ঘটনাটি উঠেছিল—কিন্তু একটু অন্যভাবে। কয়েকটি প্রভাবশালী লোকের সহানুভূতি লাভ করার দরুন ব্যাপারের জটিলতার হাত থেকে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে রেহাই পেলাম।

পূর্ণিমাকে রাঁচি উন্মাদ-আশ্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। ওর বাবাও দেখলুম ওকে আর বাড়ী নিয়ে যেতে রাজী নয়। শ্রীরামপুর কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে ওকে মোটরে সোজা আনা হলো হাওড়া। হাওড়া থেকে রাঁচি এক্সপ্রেসে যখন ওঠানো হচ্ছে—তখন একগাল হেসে ও আমার দিকে চেয়ে বললে—আমাদের সয়লাভিতে আসবেন কিন্তু একদিন? মনে থাকবে তো?

ওর বাবাকে বললে—দাদা কোথায় বাবা? দাদাকে দেখছি নে। দাদার কাছে

কানের ফুল ছুটো খোলা রয়েছে, কান বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছে—

এ-সব কয়েক বছর আগেকার কথা। অনেকেই বুঝতে পারবেন আমি কোন্ ঘটনার কথা বলছি। মানুষ চলে যায়, স্মৃতি থাকে। জীবনের উপর কত চিতার ছাই ছড়ানো, সেই ছাইয়ের সূক্ষ্ম স্তরে বহু প্রিয়-পরিচিত জনের পদচিহ্ন আঁকা।

এই শ্যামলা পৃথিবী, রৌদ্রালোক, পরিবর্তনশালী ঋতুচক্রের আনন্দ থেকে নির্ব্বাসিতা সে হতভাগিনীর কথা মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে তখন ভাবি সে নেই, এত দিনে সুদূর রাঁচির উন্মাদ-আশ্রমে তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান হয়ে গেছে—ভগবান আর ওকে কতকাল কষ্ট দেবেন?

বলা বাহুল্য, এই কাহিনীর মধ্যে আমি সব কাল্পনিক নাম-ধাম ব্যবহার করেছি, কারণ সহজেই অনুমেয়।

জনসভা

আমার তখন বয়স নয় বছর। গ্রামের উচ্চ-প্রাইমারী স্কুলে পড়ি এবং বয়সের তুলনায় একটু বেশী পরিপক্ব। বিশু একদিন ক্লাসে একখানা বই আনিল, ওপরে সোনালীচুল হাতে একটি মেয়ের ছবি (ত্রিশ বছর আগেকার কথা বলিতেছি মনে রাখিবেন), রাঙা কাগজের মলাট, বেশী মোটা নয়, আবার নিতান্ত চটি বইও নয়।

আমি সেই বয়সেই ছু-একখানা সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনের নভেল পড়িয়া ফেলিয়াছি; পূর্ব্বেই বলি নাই যে বয়সের তুলনায় আমি একটু বেশী পাকিয়াছিলাম? সেজন্য বিশু আমাকে ক্লাসের মধ্যে সমঝদার ঠাওরাইয়া বইখানি আমার নাকের কাছে উঁচাইয়া সগর্ব্বে বলিল, "এই ভাখ, আমার দাদা এই বই লিখেছেন, দেখেছিস?"

বলিলাম, "দেখি কি বই?"

মলাটের ওপরে লেখা আছে 'প্রেমের তুফান'। হাতে লইয়া দেখিলাম, লেখকের নাম, শ্রীভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দিনাজপুর, পীরপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত দাম আট আনা।

"তোর দাদার লেখা বই, কি রকম দাদা?"

বিশু সগর্ব্বে বলিল, "আমার বড়মামার ছেলে, আমার মামাতো ভাই।"

এই সময় নিতাই মাস্টার মহাশয় ক্লাসে ঢোকাতে আমাদের কথা বন্ধ হইয়া গেল। নিতাই মাস্টার আপন মনে থাকিতেন, মাঝে মাঝে কি এক ধরনের অসংলগ্ন কথা বলিতেন আর আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিতাম। জোরে হাসিবার উপায় ছিল না তাঁর ক্লাসে।

অমনি তিনি বলিয়া বসিতেন, "এই তিনকড়ি, এদিকে এস, হাসছ কেন? হানা চায়

আনা সের, কেরোসিন তেল ছ-পয়সা বোতল—"

এই সব মারাত্মক ধরনের মজার কথা শুনিয়াও আমাদের গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, হাসিয়া ফেলিলেই মার খাইয়া মরিতে হইবে।

বর্তমানে নিতাই মাস্টার ক্লাসে ঢুকিয়াই বলিলেন, "ও-খানা কি বই নিয়ে টানাটানি হচ্ছে সব? তিনটের গাড়ী কাল এসেছিল তিনটে পঁচিশ মিনিটের সময়, পঁচিশ মিনিট লেট— অমুক বিস্কুট পয়সায় দশখানা—"

আমরা হাসি অতি কষ্টে চাপিয়া মেজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

নিতাই মাস্টার বইখানা হাতে লইয়া বলিলেন, "কার বই?"

বিষ্টু সগর্বে বলিল, 'আমার বই, স্যার। আমার দাদা লিখেছেন, আমাদের একখানা দিয়েছেন—"

নিতাই মাস্টার বইখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন, "হুঁ, থাক্, একটু পড়ে দেখব।"

পরের দিন বইখানা ফেরৎ দিবার সময় মন্তব্য করিলেন, "লেখে ভাল, বেশ বই। ছোকরা এর পর উন্নতি করবে।"

বিষ্টু বাধা দিয়া বলিল, "ছোকরা নন স্যার তিনি, আপনাদের বয়সী হবেন—"

নিতাই মাস্টার ধমক দিয়া বলিলেন, "বেশী কথা বইবে না, চুপ করে বসে থাকবে। আবার কথার ওপর কথা! পুরানো তেঁতুলে অম্বলের ব্যথা সারে, আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজো হয়।"

পুরানো তেঁতুলে অম্বলের ব্যথা সারুক আর নাই সারুক, নিতাই মাস্টারের সার্টিফিকেট শুনিয়া বিষ্টুর দাদার বইখানা পড়িবার অত্যন্ত কৌতূহল হইল, বিষ্টুর নিকট যথেষ্ট সাধ্য-সাধনা করিয়া সেখানা আদায় করিলাম। বাড়ীতে বাবা ও বড়দার চক্ষু এড়াইয়া বইখানাকে শেষ করিয়া বিষ্টুর এই অদেখা দাদাটির প্রতি মনে মনে ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম। একটি মেয়েকে কি করিয়া দুষ্ট লোক ধরিয়া লইয়া গেল, নানা কষ্ট দিল, অবশেষে মেয়েটি কিভাবে জলে ডুবিয়া মরিল, তাহারই অতি মর্মন্তুদ বিবরণ। পড়িলে চোখে জল রাখা যায় না।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, একদিন বিষ্টু বলিল, "জানিস পাঁচু, আমার সেই দাদা, যিনি লেখক, তিনি এসেছেন কাল আমাদের বাড়ী।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। "কখন এসেছেন? এখনও আছেন?"

"কাল রাতের ট্রেনে এসেছেন, দু-তিন দিন আছেন।"

"সত্যি? মাইরি বল—"

"মা-ইরি, চল্ বরং, আয় আমাদের বাড়ী"

আমার ন-দশ বৎসর বয়সে ছাপার বই কিছু কিছু পড়িয়াছি বটে, কিন্তু যাহারা বই লেখে তাহারা কিরূপ জীব কখনো দেখি নাই। একজন জীবন্ত গ্রন্থকারকে স্বচক্ষে দেখিবার লোভ

সংবরণ করিতে পারিলাম না ; বিনুর সহিত তাহার বাড়ী গেলাম।

বিনুদের ভেতর-বাড়ীতে একজন একহারা কে বসিয়া বিনুর মার সঙ্গে গল্প করিতেছিল, বিনু দূর হইতে দেখাইয়া বলিল, 'উনিই'। আমি কাছে যাইতে ভরসা পাইলাম না। সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া দূর হইতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। লোকটি একহারা, শ্যামবর্ণ, অল্প দাড়ি আছে, বয়স নিতাই মাস্টারের চেয়ে বড় হইবে তো ছোট নয়, খুব গম্ভীর বলিয়াও মনে হইল। লোকটি সম্প্রতি কাশী হইতে আসিতেছে, বিনুর মায়ের কাছে সবিস্তারে সেই ভ্রমণ-কাহিনীই বলিতেছিল। প্রত্যেক কথা আমি গিলিতে লাগিলাম ও হাত-পা নাড়ার প্রতি ভঙ্গীটি কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

লেখকরা তাহা হইলে এই রকম দেখিতে।

সেই দিনই গ্রামে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল, বিনুর বাবা মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে গল্প করিয়াছেন, যাঁহার বড় শালার ছেলে বেড়াইতে আসিয়াছে, মস্ত একজন লেখক, তার লেখার খুব আদর। ফলে গ্রামের লোক দলে দলে দেখা করিতে চলিল। বিনুর মা মেয়েমহলে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, 'প্রেমের তুফানে'র লেখক তাদের বাড়ী আসিয়াছেন। উক্ত বইখানি ইতিমধ্যে পুরুষেরা যত পড়ুক আর না পড়ুক, গ্রামের মেয়ে-মহলে হাতে হাতে ঘুরিয়াছে খুব, অনেক মেয়ে পড়িয়া ফেলিয়াছে, বিনুর মা ভ্রাতুষ্পুত্রগর্বে স্ফীত হইয়া নিজে যাচিয়াও অনেককে পড়াইয়াছেন, সুতরাং মেয়ে-মহলও ভাঙ্গিয়া আসিল একজন জলজ্যান্ত লেখককে দেখিবার জন্য। বিনুদের বাড়ী দিনরাত লোকের ভিড় ; একদল যায়, আর একদল আসে। অজ পাড়াগাঁ, এমন একজন মানুষের—যার বই ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে, দেখা পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতই দুর্লভ।

কদিন কি খাতির এবং সম্মানটাই দেখিলাম বিনুর দাদার! এর বাড়ী নিমন্ত্রণ, ওর বাড়ী নিমন্ত্রণ, বিনুর মা সগর্বে মেয়ে-মহলে গল্প করেন, 'বাছা এসে ক'দিন বাড়ীর ভাত মুখে দিলে? নেমন্তন্ন খেতে খেতেই ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে—'

ভাবিলাম—সত্য, সার্থক জীবন বটে বিনুর দাদার! লেখক হওয়ার সম্মান আছে।

ভূষণদার সহিত এইভাবে আমার প্রথম দেখা।

অত অল্প বয়সে অবশ্য ভূষণদাদার নিকটে ঘেঁষিবার পাত্তা পাই নাই—কিন্তু বছর দুই পরে তিনি যখন আবার আমাদের গ্রামে আসিলেন, তখন তাঁহার সহিত মিশিবার অধিকার পাইলাম—যদিও এমন কিছু ঘনিষ্ঠভাবে নয়। তিনি যে মাদৃশ বালকের সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহাতেই নিজেকে ধন্য মনে করিয়া বাড়ী গিয়া উত্তেজনায় রাত্রে ঘুমাইতে পারিলাম না।

সে কথাও অতি সাধারণ ও সামান্য।

দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া ভূষণদাদা বলিয়াছিলেন, "তোমার নাম কি হে? তুমি বুঝি বিনুর সঙ্গে পড়?"

শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি নাম তোমার ?"

"শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।'

"বেশ।"

কথা শেষ হইয়া গেল। দুরু দুরু বক্ষে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। প্রথম দিনের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। পরদিন আরও ভাল করিয়া আলাপ হইল। নদীর ধারে বিনু, আমি, আরও দু-একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ভূষণদাদা বলিলেন, "বল তো বিনু, 'এ দম্ভোলি বৃত্রাসুর শিরচ্ছিন্ন যাহে'—দম্ভোলি মানে কি ? পারলে না ? কে পারে ?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি বয়সের তুলনায় পাকা ছিলাম। তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম, "আমি জানি, বলব···বজ্র।"

"বেশ বেশ, কি নাম তোমার ?"

কালই নাম বলিয়াছি ; এ দীনজনের নাম তিনি মনে রাখিয়াছেন, এ আশা করাও আমার মত অর্ব্বাচীন বালকের পক্ষে ধৃষ্টতা। সুতরাং আবার নাম বলিলাম।

"বেশ বাংলা জান তো ! বই-টই পড় না কি ?"

এ সুযোগ ছাড়িলাম না, বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বই সব পড়েছি।"

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইতিমধ্যে ভূষণদার আরও দুইখানি উপন্যাস ও একখানি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল—বিনুদের বাড়ী সেগুলিও আসিয়াছিল ; বিনুর নিকট হইতে আমি সবগুলিই পড়িয়াছিলাম।

ভূষণদাদা বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "বল কি ? সব বই পড়েছ ? নাম কর তো ?"

"প্রেমের তুফান, রেণুর বিয়ে, কমলকুমারী আর দেওয়ালী।"

"বাঃ বাঃ, এ যে বেশ দেখছি ! কি নাম বললে ?"

বিনীতভাবে পুনরায় নিজের নাম নিবেদন করিলাম।

"বেশ ছেলে ! স্যাখ তো বিনু, তোর চেয়ে কত বেশী জানে !"

গর্ব্বে আমার বুক ফুলিয়া উঠিল। একজন লেখক আমার প্রশংসা করিয়াছেন ! তারপর ভূষণদাদা (বিনুর সুবাদে আমিও তাঁহাকে তখন 'দাদা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছি) নবীন সেন এবং হেমচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন, সাহিত্য, কবিতা এবং তাঁহার নিজের রচনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন ; তার কতক বুঝিলাম কতক বুঝিলাম না— এগারো বছরের ছেলের পক্ষে সব বোঝা সম্ভব ছিল না।

বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। আমি হাই-স্কুলে ভর্তি হইলাম। একদিন ভূষণদাদা সম্বন্ধে আমি এক বিষম ধাক্কা পাইলাম আমাদের স্কুলের বাংলা মাস্টারের নিকট হইতে। কি উপলক্ষে মনে নাই, মাস্টারমশায় আমাদের ক্লাসের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাংলা

দেশের আরও দু-একজন বড় লেখকের নাম করতে কে পারে ?"

একজন বলিল, "নবীনচন্দ্র", একজন বলিল, "সুরেন ভট্‌চাজ" (তখনকার কালে বড় নাম), একজন বলিল, "রজনী সেন" (তখন সবে উঠিতেছেন)—আমি একটু বেশী জানিবার বাহবা লইবার জন্ত বলিলাম—"ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

মাস্টারমশায় বলিলেন, "কে ?"

"ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমি পড়েছি তাঁর সব বই, আমার সঙ্গে আলাপ আছে।"

"সে আবার কে ?"

আমি মাস্টারমশায়ের অজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইলাম।

"কেন, ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী খুব বড় লেখক—প্রেমের তুফান, কমলকুমারী, দেওয়ালী, বেণুর বিয়ে—এই সব বইয়ের—"

মাস্টারমশায় হো হো করিয়া উঠিলেন, ক্লাসের ছেলেদের বেশীর ভাগই না বুঝিয়া সে হাসিতে যোগ দিল। উহাদের সম্মিলিত হাসির শব্দে ক্লাসরুম ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

আমার কান গরম হইয়া উঠিল, রীতিমত অপদস্থ বিবেচনা করিলাম নিজেকে। কেন ? ভূষণদাদা বড় লেখক নন ? বা রে !

মাস্টারমশায় বলিলেন, "তোমার গাঁয়ের আত্মীয় বলে আর তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বলেই তিনি বড় লেখক হবেন তার কি মানে আছে ? কে তাঁর নাম জানে ? ও রকম বলো না।"

ভূষণদাদার সাহিত্যিক যশ ও খ্যাতি সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত কেবল একতরফা বর্ণনাই শুনিয়া আসিয়াছি বিনুর মায়ের মুখে, বিনুর মুখে, বিনুর বাবার মুখে, ভূষণদাদার নিজের মুখে। তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সরল বালক মনে। এই প্রথম আমার তাহার উপর সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

এতদিন গাঁয়ে থাকিয়া কেবল সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনের নক্তেলই পড়িয়াছি—ক্রমে স্কুল লাইব্রেরী হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও আরও অন্যান্য বড় লেখকের বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতাও জন্মিল—ফলে বছর চার-পাঁচ স্কুলে পড়িবার পরে আমার উপরে ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রভাব যে অত্যন্ত ফিকে হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি যেবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি, সেবার শ্রাবণ মাসে বিনুর ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে ভূষণদাদা আবার আমাদের গ্রামে আসিলেন। তখন আমার চোখে তিনি আর ছেলেবেলার সে বড় লেখক ভূষণচন্দ্র নন, বিনুর ভূষণদাদা, সুতরাং আমারও ভূষণ-দাদা। তখন বেশ সমানে সমানে কথাবার্ত্তা বলিলাম, দাদারও আর সে মুরুব্বিয়ানা চাল নাই, থাকিবার কথাও নয়। তিনিও সমানে সমানেই মিশিলেন।

একখানা বই দেখিলাম, বিবাহ-বাটির কুটুম্বসাক্ষাৎদের হাতে ঘুরিতেছে, কবিতার বই,

নাম,—'প্রতিমা-বিসর্জ্জন'! দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ভূষণ-দাদা কবিতা লিখিয়া বই ছাপাইয়াছেন বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বিনুও তো আর বাল্যের সেই বিনু নাই। সে বলিল—"মজার কথা শোন্, আগের বৌদিদি ষোল বছর ঘর করে ছেলেপুলের মা হয়ে মরে গেল বেচারী, তার বেলা শোকের কবিতা বেরুলো না। দ্বিতীয় পক্ষের বৌদি—দু-তিন বছর ঘর করে ডবকা বয়সেই মারা গেল কি না—দাদার তাই শোকটা বড্ড লেগেছে—একেবারে—প্র তি—মা—বি স র্জ্জ—ন!"

ভূষণদাদা আমাকেও একখানা বই দিয়াছিলেন, দু-তিন দিন পরে আমায় বলিলেন—"প্রতিমা-বিসর্জ্জন কেমন পড়লে হে?"

অতি সাধারণ ধরণের কবিতা বলিয়া মনে হইলেও বলিলাম, "বেশ চমৎকার!"

ভূষণদাদা উৎসাহের সহিত বলিলেন, "বাংলাদেশে 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম'-এর পরে আমার মনে হয়, এ ধরণের বই আর বেরোয় নি। নিজের মুখে নিজের কথা বলছি বলে কিছু মনে করো না তবে তোমাদের ছোট দেখেছি, তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই।"

ভূষণদাদার দাড়ি চুলে বেশ পাক ধরিয়াছে, তাহাকে সমীহ করিয়া চলি. সুতরাং প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া গেলাম। যদিও 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম'-এর প্রতি আমার যে খুব শ্রদ্ধা ছিল তাহা নয়, তবুও ভূষণদাদার কথা শুনিয়া সমালোচনা-শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইলাম।

ভূষণদাদার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়, অনেকদিন হইতেই জানি। তিনি ক্যাম্বেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া দিনাজপুরের এক সুদূর পল্লীগ্রামে জমিদারদের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে চাকুরি করিতেন, স্বাধীন ব্যবসা কোনদিন করেন নাই।

এবার শুনিলাম ভূষণদাদার সে চাকুরিটাও যায়-যায়। বিনুই এ সংবাদ দিল।

ভূষণদাদা আসার পরদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, তোমরা তো কলকাতার ছাত্রমহলে ঘোর, পাঁচটা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়, ছাত্রমহলে আমার বই সম্বন্ধে কি মতামত কিছু শুনেছ?"

হঠাৎ বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম, আম্‌তা আম্‌তা সুরে বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ—তা মত বেশ ভালই—

বলেন কি ভূষণদাদা! বিব্রত ভাবটা কাটিয়া গিয়া এবার আমার হাসি পাইল। কলকাতায় ছাত্রমহলে ভূষণ চাটুয্যের নামই কেউ জানে না, তার বই পড়া, আর সে সম্বন্ধে মতামত!

ভূষণদাদা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি, কি, কি-রকম বলে? আমার কোন্ বইটার কথা শুনেছ, পাষাণপুরী না দেওয়ালী?"

অকূলে কূল পাইলাম। ভূষণদাদার বইয়ের নাম কি আমার একটাও মনে ছিল ছাই! বলিলাম, "হ্যাঁ, ওই পাষাণপুরীর কথাই যেন শুনেছি।"

ভূষণদাদা আর আমায় ছাড়িতে চান না। কি শুনিয়াছি, কোথায় শুনিয়াছি, কাহার কাছে শুনিয়াছি? পাষাণপুরী তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তবুও তো তিনি পাবলিশার পান নাই, সব বই-ই নিজে ছাপাইয়াছেন, দিনাজপুরের অজ পাড়াগাঁয়ে বসিয়া বই বিক্রী ও বিজ্ঞাপনের কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই।

বিনু আমায় আড়ালে বলিল, "এই অবস্থা, পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পান ডাক্তারী করে, সংসারই চলে না, তা থেকে খরচ করেন ওই সব বাজে বই ছাপতে। ভূষণদাদার চিরকালটা এক রকম গেল। বাড়িক যে কত রকমের থাকে।"

ইহার পর আরও ছ-সাত বছর কাটিয়া গেল।

আমি পাশ করিয়া বাহির হইয়া নানারকম কাজকর্ম করি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু লিখিও।

ভূষণদাদার প্রভাব আমার জীবন হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই, মনের তলে কোথায় চাপা ছিল, লেখক হওয়া একটা মস্ত বড় কিছু বুঝি! সেই যে আমাদের গ্রামে বাল্যকালে সেবার ভূষণদাদাকে সম্মান পাইতে দেখিয়াছিলাম, সেই হইতেই বোধ হয় লেখক হওয়ার সাধ মনে বাসা বাঁধিয়া থাকিবে, কে জানে?

আমার লেখক-জীবন যখন পাঁচ-ছ বছরের পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, দু-চারখানা ভাল মাসিক পত্রিকায় লেখা প্রায়শঃ বাহির হয়, কিছু কিছু আরও হইতেছে, সে সময় কি একটা ছুটিতে দেশে গেলাম। বিনুদের বাড়ীতে গিয়া দেখি, ভূষণদাদা অসুস্থ অবস্থায় সেখানে সপরিবারে কিছুদিন হইতে আছেন। আমায় বলিলেন, "পাঁচু, শুনলাম আজকাল লিখছ? কোন্ কোন্ কাগজে লেখা বেরিয়েছে?"

কাগজগুলির কয়েকখানি আমার সঙ্গেই ছিল, ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই সেগুলি দেখিয়াছে। ভূষণদাদাকেও দেখাইলাম—দেখাইয়া বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করলাম।

ভূষণদাদা কাগজ কখানা উল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "এইসব কাগজে লিখছ? বেশ বেশ। এসব তো বেশ নাম-করা পত্রিকা? একটু ধরাধরি করতে হয়, না? তুমি কাকে ধরেছিলে? একটু ধরাধরি না করলে আজকাল কিছুই হয় না। গুণের আদর কি আর আছে? এই দেখ না কেন, আমি পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে নিজেকে পুশ্ করতে পারলাম না। আমার 'নারদ'-কাব্য পড় নি? দু-বছর ধরে খেটে লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি। কিন্তু হলে হবে কি, ওই ধরাধরির অভাবে বইখানা নাম করতে পারছে না।

বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভূষণদাদার মুখে তাঁহার 'নারদ'-কাব্যের অনেক ব্যাখ্যা শুনিলাম। অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইলেও তাহার মধ্যে নিজস্ব জিনিস কি একটা ঢুকাইয়া দিয়াছেন ভূষণদাদা, অমন দার্শনিকতা আধুনিক কোন বাংলা গ্রন্থে নাই, এ কথা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন।

বলিলাম, "বইখানা ছেপেছে কারা?"

"আমিই ছেপেছি। লোকের দোরে দোরে বেড়িয়ে ছাপানোর জন্যে খোশামোদ করা—ওসব আমার দ্বারা হবে না।"

মনে হইল ভূষণদাদা আমারই প্রতি যেন বক্রকটাক্ষ করিতেছেন এই সব উক্তি দ্বারা। যাহা হউক, কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

বছরখানেক পরে আমি আমার কর্মস্থলে একটা বুকপোস্ট পাইলাম। খুলিয়া দেখি, ভূষণদাদা সেই 'নারদ'-কাব্যখানি আমায় পাঠাইয়াছেন, সঙ্গে একখানা বড় চিঠি। 'নারদ'-কাব্যখানির উচ্চ প্রশংসা করিয়া বহুলোক ইতিমধ্যে চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিগুলি তিনি পুস্তিকাকারে ছাপিয়া ঐ সঙ্গে আমায় পাঠাইয়াছেন। আমি যেন কলিকাতায় কোন নামকরা কাগজে বইখানির ভাল ও বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করিয়া দিই, এই ভূষণদাদার অনুরোধ।

ছাপানো প্রশংসাপত্রগুলি পড়িয়া আমার খুব ভক্তি হইল না। একজন মফঃস্বলের কোন শহরের প্রধান ডাক্তার লিখিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্রের রৈবতক কাব্যের পরে আর একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য আবার বাংলা সাহিত্যে বাহির হইল বহুকাল পরে। আর একজন কোথাকার প্রধান উকিল লিখিতেছেন, কে বলে বাংলা ভাষার দুর্দ্দিন? বাংলা সাহিত্যের দুর্দ্দিন? যে দেশে আজও 'নারদ'-কাব্যের মত কাব্য রচিত হয়ে থাকে (মনে ভাবিলাম, ভদ্রলোক কি বাংলা কবিতার কিছুই পড়েন নাই?) সে দেশে—, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন দিয়া 'নারদ'-কাব্য পড়িলাম। নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক'-এর ব্যর্থ অনুকরণ। লম্বা লম্বা বক্তৃতা—মাঝে মাঝে 'ভূমা', 'প্রপঞ্চ', 'ক্ষর', 'অক্ষর', 'শাশ্বত', 'অব্যয়' প্রভৃতি শব্দের ভীষণ ভীড়—ইহাকে 'নারদ'-কাব্য না বলিয়া গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যে ব্যাখ্যা বলিলেও চলিত।

আমি চিঠির উত্তরে লিখিলাম, 'নারদ' বেশ লাগিয়াছে, তবে কলিকাতায় কোন নামকরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। সে চিঠির উত্তরে ভূষণদাদা আমায় আরও দুই-তিনখানি পত্র লিখিলেন—যদি বইখানি আমার ভাল লাগিয়া থাকে, তবে সে কথা ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সৎসাহস থাকা আবশ্যক ইত্যাদি। সে সব চিঠির উত্তর দিলাম না।

ইহার বছরখানেক পরে আমি আমার বিদেশের কর্মস্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। শ্রাবণ মাস, তেমনি বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। দিনে রাত্রে বৃষ্টির বিরাম নাই। এ-বেলা একটু ধরিয়াছে বলিয়াই বাহির হইয়াছি। গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়া একখানা হ্যাণ্ডবিল হাতে পড়িল। হ্যাণ্ডবিলখানা ফেলিয়া দেওয়ার পূর্ব্বে অন্যমনস্কভাবে সেখানার উপর একটু চোখ বুলাইয়া লইতে গিয়া দস্তরমত বিস্মিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। উহাতে লেখা আছে—

'নারদ'-কাব্যের খ্যাতনামা কবি
বঙ্গভারতীর কৃতী সন্তান
শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে (বড় বড় অক্ষরে)
সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কলিকাতাবাসিগণের
জনসভা (আধইঞ্চি লম্বা অক্ষরে)
স্থান—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হল, সময়—সন্ধ্যা ৬৷৷০টা।
সভাপতিত্ব করিবেন
একজন খ্যাতনামা নামজাদা প্রবীণ সাহিত্যিক।

ব্যাপার কি? চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—ভূষণদাদাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কলিকাতাবাসিগণ (কি ভয়ানক ব্যাপার!) জনসভা আহ্বান করিয়াছেন ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুট হলে অতবড় নামজাদা সাহিত্যিকের সভাপতিত্বে! কই 'নারদ'-কাব্যের এতাদৃশ জনপ্রিয়তা তো পূর্ব্বে মোটেই শুনি নাই? যাহা হউক, হইলে খুব ভাল কথা, কিন্তু কলিকাতা-বাসিগণ কি ক্ষেপিয়া গেল হঠাৎ?

হ্যাণ্ডবিলের তারিখ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা সভা। সাড়ে ছ'টার বেশী দেরী নাই, যদি লোকের খুব ভিড় হয়, পৌনে ছ'টায় ইন্‌স্টিট্যুটে গিয়া ঢুকিলাম। তখনও কেহ আসে নাই—অতবড় হল একেবারে খালি। এক পাশে গিয়া বসিলাম। ছ'টা বাজিল, জনপ্রাণীরও দেখা নাই—এই সময় আবার জোরে বৃষ্টি নামিল, সওয়া ছ'টা—কেহই নাই, সাড়ে ছ'টার দু-এক মিনিট পূর্ব্বে দেখি ভূষণদাদা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে একতাড়া কাগজ বগলে হলে প্রবেশ করিতেছেন, পিছনে চার-পাঁচটি ভদ্রলোক—তাঁহাদের কাহাকেও চিনি না। তখন সভার সাফল্য সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় ভূষণদাদার সহিত দেখা করিলে তিনি অপ্রতিভ হইতে পারেন—সুতরাং হলের বাহিরে গা ঢাকা দিয়া রহিলাম।

পৌনে সাতটা—জনপ্রাণী না, সভাপতিও অনুপস্থিত। সাতটা, তথৈবচ। এমন জনশূন্য জনসভা যদি কখনও দেখিয়াছি। ভূষণদাদার অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। তিনি ও তাঁহার সঙ্গে ভদ্রলোক কয়জন কেবল ঘর-বাহির করিতেছেন, নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিত ভাবে কি পরামর্শ করিতেছেন—আবার একবার করিয়া ইন্‌স্টিট্যুট-এর গেটের কাছে যাইতেছেন। সওয়া সাতটা—কাকস্য পরিবেদনা। সাড়ে সাতটা—পূর্ব্ববৎ অবস্থা। কলিকাতাবাসিগণের জনসভায় কলিকাতাবাসিগণই আসিতে ভুলিয়া গেলেন কেমন করিয়া?

পৌনে আটটার সময় ভূষণদাদা সঙ্গীদের লইয়া বাহির হইয়া গেলেন—অল্পক্ষণ পরে আমিও হল পরিত্যাগ করিলাম।

পরদিন বিনুর মেসোমশায় তারিণীবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে চেনেন খুব ভালই—বিনুর সঙ্গে কতবার সিমলা স্ট্রীটে তাঁর বাড়ীতে গিয়াছি। কুশল প্রশ্নাদির পরে তিনি বলিলেন, "ভূষণ যে এখানে এসেছে হে, আমার বাসাতেই আজ আট দশ দিন আছে।

কি একখানা বই নিয়ে খুব ঘোরাঘুরি করছে, ওর মাথা আর মুণ্ডু! এদিকে এই অবস্থা, সতের আঠার বছরের মেয়ে একটা, পনের বছরের মেয়ে একটা—পার করবে কোথা থেকে তার সংস্থান নেই—আবার কাল দেখি নিজের পয়সায় একগাদা কি মিটিং না ফিটিং-এর হ্যাণ্ডবিল ছেপে এনেছে, আর বল কেন, একেবারে মাথা খারাপ!"

বলিলাম, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখেছিলুম বটে একখানা হ্যাণ্ডবিলে—জনসভা না কি—"

"জনসভা না ওর মুণ্ডু! ও নিজেই তো পরশু দুপুরে বসে বসে ওখানা লিখলে! আমার বাড়ীতে দুজন বেকার ভাই-পো আছে, তাদের নিয়ে কোথায় সব ঘুরছে কদিন দেখতে পাই—সাড়ে সতের টাকা প্রেসের বিল কাল দিলে দেখলাম আমার সামনে—এদিকে শুনি, বাড়ীতে নিতান্ত দুরবস্থা···অতবড় সব আইবুড়ো মেয়ে গলায়, এক পয়সার সংস্থান নেই—তার বিয়ে!"

মাঘ মাসের শেষে আমি কার্য্যোপলক্ষে জলপাইগুড়ি যাইতেছি, পার্ব্বতীপুর স্টেশনে দেখি, ভূষণদাদা একটি ব্যাগ হাতে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছেন। আমি গিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, "আরে পাঁচু যে! ভাল তো? সেই পশ্চিমেই আজকাল চাকুরি কর তো? কোথায় যাচ্ছ এদিকে?"

"আজ্ঞে একটু জলপাইগুড়িতে। আপনি কোথায়?"

"আমি একটু যাচ্ছি কলকাতায়। হ্যাঁ, তোমাকে বলি—শোননি বোধ হয়, আমার 'নারদ'-কাব্যের খুব আদর হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতায় ইন্‌স্টিট্যুট হলে প্রকাণ্ড সভা হয়ে গেল তাই নিয়ে। অমুক বাবু সভাপতি ছিলেন। খুব উৎসাহ দেখলাম লোকজনের মধ্যে খুব ভিড়—দেখবে? এই দেখ।" বলিয়াই ভূষণদাদা ব্যাগ খুলিয়া জনসভার ছাপানো হ্যাণ্ডবিল একখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়ে দেখ।"

প্রত্যাবর্ত্তন

কাকীমা তাহাকে গবাক্ষ বলিয়াই ডাকিতেন। গোবিন্দ নামটি উচ্চারণ করিতে তাঁহার নাকি কষ্ট হইত, তাই তিনি শব্দটিকে সরল করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, কি, বিদঘুটে নাম বাপু! বেছে বেছে নাম রেখেছেন গো-বি-ন্দ। উচ্চারণ করতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। ভেবেছেন ঐ নামে ডেকে বুঝি ভবনদী পার হয়ে যাবেন। মরে যাই আশা দেখে!

আর মাস্টারেরা তাহার নাম দিয়াছিলেন, 'গোবরা', কেন না বুদ্ধি বলিয়াই নাকি কোন পদার্থ হতভাগার মাথায় ছিল না। তাহার সারা মাথাটি নাকি গোবরে ভরিয়া ছিল। মাস্টারদের শিক্ষাগুণে আর সকলেই তাহাকে 'গোবরা' বলিতেই শিখিয়াছিল।

সেদিন বিকালে স্কুল হইতে ফিরিয়াই তাহার কাকার ছোট ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল, মা, গোবরা আজ ভয়ানক মার খেয়েছে!

বয়সে সে গোবিন্দের চেয়ে তিন বছরের ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে বড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সে দ্বিধা বোধ করিত। কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? দুশো বার বলেছিলুম, হতভাগাটাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে কাজ নেই, তবু যদি এ অভাগীর কথা শুনবে। মাগী মরুক চেঁচিয়ে, ওনার বয়ে গেছে! কথায় আছে না, কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি কুলো। ওনারও সেই দশা হয়েছে। কেন মার খেয়েছে রে সেণ্টু?

সেণ্টু সগৌরবে কহিল, পড়া পারে নি মা। কোন দিনও পড়া পারে না।

সেণ্টু ও গোবিন্দ এক ক্লাসে পড়ে।

কাকীমা গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, গবাক্ষ, এদিকে আয়!

বলির পশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে গবাক্ষ কাকীমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কাকীমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, পড়া পারিস নে কেন রে গবাক্ষ? টাকাগুলো কি খোলামকুচি পেয়েছিস? ইস্কুলের মাইনে, বাড়ীর মাস্টারের মাইনে, আমাদের কি তালুক-মুলুক আছে বাছা? হ্যাঁ, যদি বুঝতুম কিছু হচ্ছে তা হলে নয় এক কথা। তা নয়, এ শুধু ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ!

সেণ্টু কহিল, পিঠে বেতের দাগ বসে গেছে মা। জামা তুলে দেখ:

কাকীমা জামা তুলিয়া দেখিলেন। তারপর ধীরে ধীরে রায় প্রকাশ করিলেন, আচ্ছা, উনি আসুন আগে বাড়ী।

মকদ্দমা যেন দায়রায় সোপর্দ্দ হইল।

গোবিন্দ পড়া পারে না সত্য, কিন্তু তাহার পশ্চাতে একটি অতি সত্য নিহিত ছিল। বাড়ীতে সে পড়িবার সময় পায় না। সারাদিন কাকীমার ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকিত না। না বলিবার যো নাই। তাহা হইলে হয়তো বাড়ী হইতে দূর করিয়াই দিবেন তৎক্ষণাৎ। প্রায়ই তো তিনি বলেন, বিদি হয়ে যা, বিদি হয়ে যা; আর জ্বালাতন করিস নে আমাদের। মাগী একটা ফ্যাচাং দিয়েছে দেখ না!

সেদিন সকালবেলা সবে পড়িতে বসিয়াছে এমন সময়ে কাকীমা আসিয়া তাহাকে একটি আনি দিয়া বলিলেন, ওরে গবাক্ষ, চট করে দুপয়সার চিনি নিয়ে আয় তো। দয়া করে দুটো পয়সা ফিরিয়ে আনতে ভুলিস না যেন। তোর আবার যে ভুলো মন!

গবাক্ষ তখন বাঙ্গালা দেশে কয়টি বিভাগ আছে মুখস্থ করিতে ব্যস্ত। পড়া না করিলে সতীশবাবু তাহাকে মারিয়া রসাতল করিবেন। আশ্চর্য্য এই সতীশবাবু! গাঁট্টা মারিতে তিনি অত্যন্ত পটু। প্রথম দিন হইতে তিনি গবাক্ষকে চিনিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমেই তিনি চোখ বুজিয়াই ডাকিয়া বসেন, গোবরা, এদিকে আয়।

ঐ ডাক শুনিয়াই গোবিন্দর রক্ত শুকাইয়া যায়। তারপর তিনি হয়তো প্রশ্ন করিলেন, বল বাঙ্গলা দেশের রাজধানী কি? আর সেখানে কি কি দেখবার জিনিস আছে?

এই ভূগোল পড়াটা তাহার কোনদিনই হয় না। সতীশবাবু বলেন, তুই কি প্রতিজ্ঞা করেছিস পড়বি না? ছেড়ে দে বাপু, ছেড়ে দে!

ভূগোল পড়িবার কথা সকালে, আর প্রতিদিন সকালে তাহার কোন না কোন ব্যাঘাত ঘটিবেই ঘটিবে। সেদিন সে ভূগোল পড়িবার দুর্জ্জয় পণ করিয়া বসিয়াছিল। কাকীমার আনিটা মাটিতে রাখিয়া সে পড়িতে লাগিল, রাজসাহী, চট্টগ্রাম,···

এমন সময় নীচ হইতে কাকীমা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, ওরে ও বিদ্যাসাগর, আর জজ ম্যাজিস্টার হস্‌নে। এদিকে চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে রে।

অগত্যা তাহাকে বইখাতা গুটাইয়া উঠিতে হইল। চিনি আনিয়াই কিন্তু সে নিষ্কৃতি পাইল না। চিনির পর তাহাকে বাজার যাইতে হইল। কাকীমা বলিলেন, এক পয়সার পলতা আনিস দিকিনি, আলু দেখে কিনবি, কালকের মত যেন পোকা না থাকে, আর গুচ্ছর পাকা ট্যাঙস আনিস নে যেন, বুঝলি?

বাজার করিয়া ফিরিতেই তাহার বেলা নয়টা হইয়া গেল। কাকীমা হিসাব নিলেন। চারটি পয়সা কম পড়িল। কাকীমা চোখ পাকাইলেন, বলিলেন, বার কর বলছি পয়সা।

গোবিন্দ কহিল, আর তো কোন পয়সা ফেরে নি কাকীমা!

কাকীমা বলিলেন, আর মিছে কথা বলিস নে রে গবাক্ষ। হিসেব শেখাচ্ছিস তুই আমায়? বাজারের পয়সা চুরি! ওমা, আমি কোথায় যাব! বাড়তে বাড়তে তুই যে বেড়ে উঠেছিস! না, আজ আর তোর নিস্তার নাই। ডাক তোর কাকাকে।

গবাক্ষকে আর ডাকিতে হইল না, সেণ্টুই তাহার হইয়া কাজটি করিয়া দিল। কাকীমা বলিলেন, ওগো, দেখ তোমার গুণমণির কীর্ত্তি। ডানা উড়েছে! চুরি শিখেছে! চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা। আজ বাজারের পয়সা চুরি করবে, কাল বাক্স ভাঙবে, পরশু সিন্দুক ভাঙবে। এখন হয়েছে কি! আদরের ভাইপো তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। দোষ যে আমার!

কাকা নিজে হিসাব লইলেন। তথাপি সেই চারিটি পয়সা কম পড়িল। শত চেষ্টা করিয়াও গোবিন্দ ঐ চারিটি পয়সার হিসাব দিতে পারিল না। সহ্যেরও একটা সীমা আছে। কাকা সহ্য করিয়া করিয়া সেই চরম সীমায় সেদিন পৌঁছিলেন। তিনি অকস্মাৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিরিক্ত রাগিয়া উঠিলেন। তিনি উকিল। আজ দীর্ঘ বার বছর ধরিয়া স্থিরভাবে ছোট আদালতে প্র্যাক্‌টিস করিয়াছেন। চুরি জিনিসটার উপর তাঁহার দৃষ্টি সচরাচর সহজেই নিবদ্ধ হয়। তিনি গোবিন্দকে গুটি কয়েক জেরা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন, সে পয়সা চারিটি আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাগিলে তিনি ভীষণ হইয়া ওঠেন। তিনি বলিলেন, দেখি তোর ট্যাঁক।

অগত্যা তাহার ট্যাঁক দেখা হইল, কিন্তু পয়সা সেখানে পাওয়া গেল না। তখন কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর? বলিহারি যাই! ও এত বোকা যে পয়সা তোমার জন্যে ট্যাঁকে রেখে দেবে, না?

কথা শেষে তিনি হাসিলেন, কাকা আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, দুম্ দাম করিয়া তাঁহাকে প্রহার শুরু করিয়া দিলেন। কাকার নিকট গোবিন্দ এই প্রথম মার খাইল। কাকাই যা এতদিন তাহাকে সুনজরে দেখিতেন, আজ তিনিও তাহার প্রতি বিরূপ হইলেন। তিনি চীৎকার করিলেন, হারামজাদার জন্যে দুশো দিন আমার কথা শুনতে হবে। দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা! দুধকলা দিয়ে আমি যেন কালসাপ পুষেছি। দূর করে দিয়ে তবে ছাড়ব!

চীৎকার করিতে করিতেই তিনি অবিশ্রান্ত প্রহার করিতে লাগিলেন। কাকীমা বকিয়া চলিলেন, দোষ দাও যে আমায়, দেখ এবার ভাইপোর গুণ! গোড়াতেই আমি বলেছিলুম, ওসব ঝঞ্ঝাট পুষো না—পুষো না। তখন যদি এ দাসীবাঁদীর কথা শোন। মনে রেখো, গরীবের কথা বাসী হলে খাটে।

শেষে কাকা প্রহার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দ কিন্তু কাঁদিল না। মারিয়া কাটিয়া ফেলিলেও গোবিন্দ নাকি কাঁদে না। ইহা তাহার ছেলেবেলাকার অভ্যাস। তথাপি সেদিন কিন্তু তাহার মনটা বড় বিষণ্ণ হইয়া গেল। কলিকাতা তাহার নিকট ভাল লাগে না। প্রথম যেদিন তাহার বিধবা মা তাহার কাকাকে কহিলেন, ঠাকুরপো, এখেনে বসে থেকে থেকে তো গোবিন্দ দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে, তুমি যদি নিয়ে যাও তোমার ওখেনে তাহলে ভারী ভাল হয় ভাই। তোমার সেন্টু মেন্টুর সঙ্গে ও একটু তাহলে পড়তে পারে। নইলে ওকে এই এতটুকু বয়সেই লেখাপড়া ছাড়াতে হয়। কি করব বল? পেটে খেতে পাই না, তা আবার ছেলেকে বোর্ডিঙে রেখে লেখাপড়া শেখাব! তবে তুমি যদি দয়া কর তা আলাদা কথা।

কাকা রাজী হইয়া গেলেন। গোবিন্দ যেন সেদিন হাতে স্বর্গ পাইল কলিকাতা তাহার শিশুকালের স্বপ্ন। এই তীর্থস্থান দেখিবার জন্য শিশুকাল হইতে তাহার মনে অদম্য পিপাসা জাগিয়াছে। সেই স্বপ্ন তাহার সফল হইবে। বেশ মনে আছে, সেদিন সে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইয়াছিল। সারাদিন গ্রামময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার পরম সৌভাগ্যের কথা ঘোষণা করিয়া মরিয়াছিল। নিঃশব্দে মধ্যাহ্নে ছিপ হাতে সোনাদীঘির পাড়ে বসিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে তাহার সেই কলিকাতার কথা মনে পড়িল। সেই বুড়ো ফণি-মনসার গাছটি তাহার নিকট তখন অতিসুন্দর বলিয়া বোধ হইল। তাহাকে যেন নূতন করিয়া রঙীন কাচের মধ্য দিয়া দেখিতে লাগিল। দীঘির ধারে অসংখ্য তালগাছ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাতাস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। জলের উপর একটি স্পন্দন পর্যন্ত ছিল না। ওপাশে সারি বাঁধিয়া পদ্ম ফুটিয়া ছিল। পদ্মের পাতায় দীঘির কালো জল ঢাকিয়া গিয়াছিল। দীঘির ধার দিয়া দিয়া দুটি পাতিহাঁস পাশাপাশি সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিল। দূরে একটি কাঠঠোকরা অবিরত ঠক্ ঠক্ করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছিল। সেদিন সেই বনশোভা দেখিয়া গোবিন্দের চোখ অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তাহার ফাৎনা ডুবিয়াছে কি ভাসিতেছে, তাহার ছিপে টান পড়িল কিনা সেদিকে তাহার হুঁশ ছিল না। সে পরক্ষণেই কাপড় দিয়া তাহার অবোধ অশ্রুকণাগুলি চুপি চুপি মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার সহরে

যাওয়ার আনন্দ তাহার গ্রাম ত্যাগের দুঃখের চেয়ে গভীর হইয়াছিল।

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তাহার দীর্ঘদিনের মধুর স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহার মনোরাজ্যের কলিকাতাকে সে ফিরিয়া পাইল না। এখানে আকাশ নাই, বাতাস নাই, সবুজ ঘাস নাই, সন্ধ্যার সূর্য্যের অগণিত রঙের খেলা নাই। এখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসে না। মানুষ মানুষকে হিংসা করে, ঘৃণা করে। এখানে আছে কেবল 'পড়' 'পড়'। উঠিতে বসিতে সর্ব্বক্ষণ সে শুনিতেছে 'পড়' 'পড়'। পড়ার যূপকাষ্ঠে এখানকার সকলেই বলিপ্রদত্ত। এখানকার পাঁচিলঘেরা ক্ষুদ্রপরিসর গৃহকোণে পড়িয়া থাকিয়া বন্দীজীবন কাটাইতে সে সহসা হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার স্থান এখানে নাই। কলিকাতা তাহার নিকট কারাগার বোধ হইল।

সেদিন স্কুলে গিয়া সে তলাইয়া তলাইয়া অতীতকে দেখিতে লাগিল। সকলেই তাহাকে দূর করিবার জন্য উন্মুখ। এখানে তাহার ঠাঁই নাই। কিন্তু সে পয়সা চুরি করে নাই। আলুওয়ালাই তাহাকে ঠকাইয়া চারিটি পয়সা লইয়াছে। তাহার স্পষ্টবাদী কাকীমার কাছে এই মারাত্মক সত্য স্বীকার করিতে তাহার সাহস হয় নাই। তাই তাহাকে মিথ্যা মার খাইতে হইল। তারপর স্কুলে সতীশবাবু প্রশ্ন করিলেন, বাঙ্গলা দেশে কটা জেলা?

গোবিন্দের মুখে কোন কথা সরিল না। ইতিমধ্যে সে তাহার পাঠ রীতিমত ভুলিয়া গিয়াছে। ভূগোল তাহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। তাহার ফল স্বরূপ সতীশবাবু তাহার পিঠে দাগ বসাইয়া দিতে ভোলেন নাই। গোবিন্দকে তিনি গাঁট্টা মারিয়া মারিয়া কাহিল হইয়া গিয়াছিলেন। সে কাঁদে নাই। অগত্যা তিনি সেদিন তাঁহার বিখ্যাত গাঁট্টার পরিবর্ত্তে ম্যাপে দেখাইবার লাঠিটা ব্যবহার করিলেন। আরও বলিলেন, ছেড়ে দে বাবা, আমাদের ছেড়ে দে, দেশে গিয়ে চাষবাস করগে!

বাড়ীতে ফিরিতেই কাকীমা তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন, মানিক আমার, সোনা আমার, এস। লিখে পড়ে এসেছ, একবাটি দুধ খাও।

সেই প্রথম গোবিন্দ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, আমি খাব না।

কাকীমাও বলিলেন, ও বাবা! কুলোপানা চক্কর! না খাবি তো আমার ভারী বয়ে গেছে। আমার সাধবার গরজ!

কাকীমা সাধিলেন না, গোবিন্দও খাইতে চাহিল না। সে চুপি চুপি চিলকুঠিতে উঠিয়া গেল। চারিদিক নিঃশব্দ। সন্ধ্যা তখন ঘনীভূত হইয়াছিল। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। আকাশের এককোণে একফালি চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে একটি বৃহদাকার নক্ষত্র ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। দক্ষিণের উদাস বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। গোবিন্দর অনেক কথাই মনে পড়িল। ছেলেবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কাহিনীই তাহার স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া উঠিতে লাগিল। সুখ দুঃখ মিশ্রিত কত ক্ষণস্থায়ী দিনের মনোরম ইতিহাস। দূরান্তর হইতে সেই গ্রামের আহ্বান

আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই পাকা সোনার ধানক্ষেত···নিস্তব্ধ সোনাদীঘি, আশেপাশে তালের বন, সবুজ বাঁশের ঝাড়, হলদে পাতায় ভরা বনপথ, মর্মর শব্দ, হাস্নোজ্জ্বল শিমুল গাছ, চিক্কণ পত্র-শোভিত তেঁতুল গাছ, সব কিছু মিলিয়া তাহার নিকট অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সেই যে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময়ে পথের ধারের কঞ্চিকে ফুল হইতে মধু চুষিয়া খাইত সেটিই যেন আজ তাহার নিকট বড় প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। তাহার সোনার দেশ, সোনার মাটি। ইছামতীর ধীর কলধ্বনি, দু-একখানি জেলে ডিঙ্গি, সন্ধ্যায় কম্পমান জলের উপর সহস্র সূর্য্যমূর্ত্তি, নিঃশব্দ প্রকৃতি, তাহার নিকট বড়ই মধুর বোধ হইল। তাহার মার কথা মনে পড়িল, সেই স্নেহময়ী জননী। দুঃখিনী কত আশা করিয়াই না তাহাকে শহরে পাঠাইয়াছিলেন। যদি তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতেন শহর কি বিষাক্ত, কি বিশ্রী, কি বিস্বাদ! মার কথা মনে পড়িতেই গোবিন্দ কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু আর সে রোধ করিতে পারিল না। আজ তাহার জন্মদিন। ভাদ্র মাসে এক শুক্রবারে তাহার জন্ম। এই দিন মা তাহাকে পরমান্ন রাঁধিয়া দেন, খাইবার সময়ে তাহার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়া দেন, শাঁখ বাজান। আজ তাহার জীবনের একটি বিশেষ দিন। ভাদ্র মাসের এই শেষ শুক্রবার। এ বৎসর তাহার জন্মদিন বৃথাই কাটিল। কতদিন সে তার মার সংবাদ পায় নাই। তিনি কেমন আছেন তাহা জানিবার জন্য তাহার মন সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যায় পড়িবার সময় তাহার অতিবাহিত হইতেছে। না, সে আজ আর পড়িতে যাইবে না। সেই তো ছোট ঘরখানিতে বসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে হইবে। এতটুকু থামিবার অবকাশ নাই, তাহা হইলেই মাস্টারের শাসনদণ্ড। সেই বিশ্রী ট্র্যান্সলেশন, সেই উৎকট গ্রামের কসরৎ। এসব কিছু তাহার ভাল লাগে না। না, সে লেখাপড়া শিখিতে চায় না। এইরূপ কত কি আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে কখন সে নিজের অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল তাহা হুঁশ নাই, সে স্বপ্ন দেখিল, সে যেন দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার মা যেন বকিতেছেন, কেন এলি? বেশ তো ছিলি!

তিনি জানেন না তো তাহার ছেলে কি সুখে আছে। জানিলে তিনি নিশ্চয় গোবিন্দকে এই মরুভূমিতে পাঠাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহার যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন কত রাত্রি তাহা বুঝিতে পারিল না। কেবল এইটুকু বুঝিল, রাত্রি গভীর হইয়াছে। সকলেই যে যার গৃহে নিঃশব্দে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে কেহই পড়িতে বা খাইতে ডাকে নাই। না কাকা না কাকী। এমন সময়ে নিকটের গীর্জ্জার ঘড়িতে সুর করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল। গোবিন্দ তাহার চক্ষু মুছিল। ওঃ, রাত্রি তো ভোর হইল প্রায়। এই পাঁচটার পর ছয়টায় তাহাদের দেশের একটি ট্রেন আছে। বাড়ীর কথা মনে পড়িতেই সে সহসা উঠিয়া বসিল। না, সে আর এখানে থাকিবে না। সে এই ছয়টার গাড়ীতেই দেশে ফিরিয়া যাইবে। চুপিচুপি তাহার ছোট্ট ক্যাশ-বাক্সটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। আসিবার সময়ে এই বাক্সটি তাহাকে তাহার মা দিয়াছিলেন।

সে যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। চারিদিকে খররৌদ্র পড়িয়াছিল। ভোরবেলা হয়তো একপশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। একটি রাখাল বালক বটের ঝুরি ধরিয়া নিবিড় আরামে দোল খাইতেছিল। পাশ দিয়া একটি গরুর গাড়ী চাকার শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। দুটি শালিকপাখী ডাকাডাকি করিয়া মাঠের উপর লুকোচুরি খেলিতে লাগিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল তাহার মা উনানে আগুন দিতেছেন। ফুঁ দিয়া দিয়া তাঁহার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। অজস্রধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি অকস্মাৎ গোবিন্দকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে, চলে এলি যে বড় ?

গোবিন্দ মার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিল। তারপর বলিল, তোমায় ছেড়ে আমি আর কখ্খনো সেখানে যাব না।

মা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, তাই হবে বাবা। আমি আর তোমায় হাতছাড়া করছি না। এ কি হয়েছে চেহারার ছিরি।

গোবিন্দ একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তার মুখ দিয়া আর কোন কথা সরিল না।

প্রাবল্য

কথাটি শুনিয়া মন খারাপ হইয়া গেল। পাশের ঘরের বধূটির মেয়ের নাকি ভারী অসুখ। দিন দশ ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর হাস্যমুখর মুখখানি দুর্ভাবনার ছায়াপাতে ম্লান হইয়াছে। তাহার অনর্গল কলকণ্ঠ ক্ষান্ত হইয়াছে। সে প্রভাত হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত আমার স্ত্রীর সহিত কত অসংখ্য গল্প করিত--হাসিয়া হাসিয়া খুন হইত। আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ তাহাদের সহিত তাল রাখিয়া আমাদের নিঃসন্তান সংসার-জীবন বহিয়া যাইতেছিল।

মমার বয়স বেশী নয়, বড় জোর বছর একুশ হবে। কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে রীতিমত পাকা গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কথায় এবং কর্মে সর্ব্বত্র সেই আভাস পাওয়া যায়। রবিবারে দাড়ি কামাইলে নাকি শরীরের বৃদ্ধি কমিয়া যায়, বৃহস্পতিবারে আমিষ ভক্ষণ করিলে কোন্ এক দুষ্ট দেবতার কোপে পড়িতে হয় ইত্যাদি অগণিত বিধিনিষেধের বেড়াজালে নিজেকে বদ্ধ করিয়া অতি সন্তর্পণে সে দিন গুণিয়া যাইতেছিল। তিন প্রাণীর সমবায়ে তাহার ক্ষুদ্র সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে···তাহার কর্মব্যস্ত স্বামী···ও স্বর্গের পরীর মত ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে। এখনও তাহার ঠিকমত কথা ফুটে নাই। বয়স অতি অল্প বলিয়া টলিয়া টলিয়া চলিতে থাকে। কারণে অকারণে রাঙ্গা ঠোঁটদুখানি কাঁপাইয়া হাসিয়া

ওঠে। তাহার নামকরণ করিয়াছে 'কমলা', কিন্তু সচরাচর তাকে 'কমলি' বলিয়া।

আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সে কমলাকে বড় ভালবাসে। অষ্টপ্রহর তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া দেয়। তাহাকে খাওয়ানো, স্নান করানো সমস্ত খুঁটিনাটির ভার আমার স্ত্রী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। সারাদিন সে আমাদের ঘরেই থাকে। রাত্রে তাহার মা আসিয়া ডাকে, কমলি কোথায় দিদি?

স্ত্রী কহিল, ঘুমুচ্ছে ভাই।

রমা বলিল, রাতেও রেখে দেবে নাকি?

স্ত্রী কহিল, থাকত যদি তো রাখতুম; কিন্তু ভাই, রাতদুপুরে মার জন্যে যদি কাঁদে!

রমা কহিল, অত আস্কারা দিও না দিদি।

স্ত্রী কহিল, আস্কারা নয় ভাই, আস্কারা নয়। তুমি ছেলেমানুষ, ছেলে মানুষ করার কি জান?

রমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কি মিথ্যুক গো তুমি। ছেলে মানুষ করার সব কিছু তোমার জানা আছে বুঝি? না জানি পেটের পাঁচটা হলে কি দেমাকই না হত!

স্ত্রীর মুখ মুহূর্তের জন্য পাংশু হইল। তাহার বক্ষ দলিয়া পিষিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল। রহস্যের ছলে কথাটি মুখ দিয়া বাহির হইয়া আর একজনকে যে এরূপভাবে আঘাত করিতে পারে, রমা হয়ত তাহা জানিত না। ঐ শব্দগুলি জোড়া দিয়া একটি যে বিশ্রী শ্রুতিকটু বাক্যের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা রমার অবিদিত ছিল। সে অপ্রস্তুতে পড়িল। আমার স্ত্রীর হাতদুখানি চাপিয়া ধরিয়া করুণ সুরে মিনতি করিল, রাগ করলে দিদি? আমি না বুঝে একটা কথা বলে ফেলেছি।

রমার কাতর মুখ দেখিয়া স্ত্রীর পাষাণ-হৃদয় দ্রব হইল। সে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি আনিয়া কহিল, ওমা! কি এমন মন্দ কথা বলেচ ভাই? ও আমার বরাত। তবে কি জান, মেয়েটা আমায় একেবারে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে।

রমা কহিল, ওর মা যে কে তাই ও ভাল করে বুঝতে পারে না। আর জন্মে তুমি ওর মা ছিলে নিশ্চয়।

স্ত্রী কহিল, মাইরি বলছি, বিচ্ছেদ যদি আমাদের মধ্যে কখনও হয় তো তোমার আমার সঙ্গেই হবে। কমলি যেন তার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। ও যেখানে খুশী থাকবে।

রমা হাসিতে লাগিল, বলিল, এখন থেকে অত ভাবনা নেই তোমার দিদি। দেখে নিও ও ঠিক তোমার কাছেই থাকবে।

স্ত্রী কহিল, ওকে দু'দণ্ড না দেখতে পেলে আমার বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে।

আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমার স্ত্রী কিসের জোরে কমলিকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিল। কেমন করিয়া দিনে দিনে পলে পলে তাহার উষর বাৎসল্যবর্জিত জীবন-মরুতে স্নেহপ্রেমের বিরাট মহীরুহ সৃষ্ট হইল? কেমন করিয়া তাহার নিষ্ফল হৃদয় নিঃস্বার্থ-ভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া একজন অচেনাকে দুহাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল! সত্য কথা

বলিতে কি, আমার স্ত্রী কমলিকে তাহার জননীর চেয়ে বেশী ভালবাসিত বলিয়া বোধ হইত।

একদিন স্ত্রী কমলিকে কোলে শোয়াইয়া দুধ খাওয়াইতেছিল। তাহার মুখের মধ্যে ঝিনুক পুরিয়া কহিল, তুই দিন দিন ভারী দুষ্টু হচ্ছিস বাপু। বসে দুধ খেতে শিখবি কবে?

আমি কহিলাম, শ্বশুর বাড়ী গিয়ে।

স্ত্রী আমার প্রতি একটি বিলোল কটাক্ষ হানিয়া কহিল, তুমি থাম দিকিন। দেখছিস তো কমলি, তোর জন্যে লোকের পাঁচশো কথা শুনতে হয়। দাও দিকি গামছাটা, মুখ হাত পা মুছিয়ে দেব।

গামছা দিয়া কহিলাম, অতটা ভাল নয় সরো।

সরো অর্থাৎ সরোজিনী, আমার স্ত্রী। কহিল, মানে?

মরীয়া হইয়া বলিলাম, যাই হোক, পর ভিন্ন তো আর কিছু নয়।

আমার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, তাহার অবকাশও পাইলাম না। স্ত্রী তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিল, তোমার ঐ এক সৃষ্টিছাড়া কথা। দেখ, ও অলক্ষুণে কথা আমায় কখনও বলো না। আমার কমলি-মাকে তুমি পর ভাবতে পার, কিন্তু আমি পারি না। মরে গেলেও পারব না। কমলি, তুই আমায় পর ভাবিস?

কমলি নেহাৎ ছেলেমানুষ। সংসারে এই সব তীক্ষ্ণ বাক্যের অর্থ জানিত না। সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, ধ্যেৎ!

সুতরাং আমার একটিও কথা বলিবার রহিল না।

কমলাকে মধ্যস্থ করিয়া আমাদের দাম্পত্যজীবনে মাঝে মাঝে কলহ হইত। আজ তাহার খেলনা চাই—কাল তাহার পোষাক চাই—তার পরদিন জরির জুতো চাই। এই অসংখ্য অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে করিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। আমি মানুষ—অমন নিঃস্বার্থভাবে জানিয়া শুনিয়া পরের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজী নই। স্ত্রী কহিত, তোমার হাত দিয়ে যদি জল গলে!

আমি কহিলাম, যেন জন্মে জন্মে না গলে।

স্ত্রী কহিল, ছিঃ! ছিঃ! লোকে বলবে কি?

কহিলাম, জান, বেচারা কাক কোকিলের ডিমে তা দেয়!

আসলে আমি কমলিকে আদৌ সুনজরে দেখিতাম না।

এহেন কমলির নাকি অসুখ—অসুখ নাকি সহজ নয়, কারণ ডাক্তার পর্য্যন্ত মুখ ঘুরাইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে নাকি আরও আগে দেখানো উচিত ছিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, বল কি? আগে তো শুনি নি!

বিশুষ্ক মুখে স্ত্রী কহিল, মা আবাগী কি বলেছে সে কথা?

আমি কহিলাম, বড়ই দুঃসংবাদ।

স্ত্রী যুক্তহস্ত ললাটে ঠেকাইয়া কহিল, মা মঙ্গলচণ্ডী! তুমি আমার বাছাকে ভাল করে দাও মা।

ব্যস্তভাবে বাজারের থলি খুঁজিতে খুঁজিতে কহিলাম, বাজার থেকে আজ কি আনবে বল তো?

স্ত্রী কহিল, আজ আর বাজারে গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং দুটো চিঁড়ে-মুড়কি খেয়ে আজ আপিস যাও।

কহিলাম, আর তুমি?

স্ত্রী কহিল, আমার কথা আমি ভাবব।

অগত্যা ফলার খাইয়া সেদিন যথাসময়ে আপিসে হাজির হইলাম। যাহা হউক, সেখানে তো আর স্নেহমমতার বালাই নাই—সেখানে স্ত্রীর ন্যায় আব্দার খাটিবে না। আত্মীয়-স্বজনহীন, শূন্য প্রাণহীন, কর্মমুখর আপিস।

কমলির অসুখ আঁকাবাঁকা পথে মোড় ঘুরিতে ঘুরিতে আগাইয়া চলিল। আমার স্ত্রীর মন সংসারে আর বসিল না কিছুতেই—ভাত গলে না কিংবা গলিয়া যায় অত্যন্ত; তরকারিতে ঝাল বেশী হয় কিংবা ঝালই হয় না; হয়ত নুন বেশী হয় কিংবা আদৌ হয় না। স্ত্রীর তো ঠিকমত খাওয়াই হয় না। প্রাণধারণের জন্য ঐ যা দুবেলা দুটো দাঁতে কাটা। রাত্রি-দিন সে অক্লান্ত-ভাবে কমলির সেবা করিতে লাগিল। আমি একদিন কহিলাম, শেষকালে তুমিও কি পড়বে!

স্ত্রী উদাস কণ্ঠে কহিল, জানি না।

বলিলাম, জানি না নয়। অমনি করে মিছিমিছি নিজের বিপদ ডেকে এনো না।

স্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, কি পাষাণ গো তুমি।

সুতরাং সেইখানেই সে প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল

সেদিন রবিবার।

বিকালবেলা স্ত্রী কহিল, আমি উনুনে আগুন দিচ্ছি। কোথাও যেও না যেন। সকাল সকাল আজ খেয়ে নাও।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

স্ত্রীর গণ্ড বাহিয়া মুক্তার ন্যায় অশ্রুকণা ঝরিতে লাগিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে সে কহিল, কি জা ন, আজ যেন মেয়েটাকে ভাল বুঝছি না। সত্যি আমার হাত পা অবশ হয়ে গেছে। কোন কাজ আর ভাল লাগছে না।

সন্ধ্যার পরই খাইতে বসিলাম। অর্দ্ধেক খাওয়া হইয়াছে, এমন সময়ে পাশের ঘরে মা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে কমলারে, তুই কোথায় গেলিরে?

সেই বিচ্ছেদবেদনাবিধুর ক্রন্দন-শব্দে আকাশ বাতাস ঝী-ঝী করিয়া উঠিল। স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল, তাহার হাত হইতে ভাতের থালা পড়িয়া গেল। সে জড়িতকণ্ঠে কহিল, পাতের গোড়ায় একটু জল দাও।

আমি স্ত্রীর কথা পালন করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। স্ত্রী কহিল, ওকি, খেলে না যে বড়?

বলিলাম, পাষাণ গলে গেছে।

স্ত্রী নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিল। পরক্ষণেই মিলিত কণ্ঠে দুইজনে ঘোর রবে দিকে দিকে মৃত্যুর বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দিল। রমার স্বামী সমস্ত পুরুষত্ব খোয়াইয়া ঘরের কোণে বসিয়া বার বার ডুকরাইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। আমি হেন নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও চক্ষু যেন ছল ছল করিয়া উঠিল। কমলি এ মরজগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সহস্র ব্যাকুল আহ্বানেও সে ফিরিয়া আসিবে না। এ কথা স্মরণ করিতে কোথা হইতে এক অনির্দ্দেশ্য উদ্বেল বায়ু কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের পথ বহিয়া আসিয়া মধ্যপথ হইতে কেন জানি ফিরিয়া গেল। আমার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিলাম—কখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, সমস্ত কর্ত্তব্যভার আমার উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। আমি না করিলে কমলির সৎকারের কোন সম্ভাবনা নাই। কমলির বাপের নিকট গিয়া বলিলাম, রবীনবাবু, আপনি একটু স্থির হোন।

স্থির হওয়া তো দূরের কথা, রবীনবাবু বালকের ন্যায় আমায় জড়াইয়া ধরিয়া আকুল হইয়া উঠিল, কি হবে দাদা!

প্রবোধ দিলাম, আঃ! আপনার এত বিচলিত হলে চলবে কেন? আপনি পুরুষ-মানুষ। জানেন তো ভগবান বলেছেন, 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।'

কথাটা নিজের কানেই যেন বিঁধিতে লাগিল। আমার কথায় কোন কাজ হইল না। রবীনবাবু বিন্দুমাত্র তাহাতে কর্ণপাত করিল না।

সুতরাং আমি লোক-সংগ্রহের জন্য বাহির হইলাম। নটার সময় ফিরিয়া সেই একটানা ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সেই সুর করিয়া করিয়া পরপারবর্ত্তী বধির যাত্রীর নিকট অসংখ্য অভিযোগ। দেখিলাম, ইহার মধ্যেই আমার স্ত্রীর গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে মেঝের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে, ওরে কমলিরে, পর বলে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয় রে!

আর রমা? তাহাকে দেখিয়া অবাক হইলাম। সে কমলির বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে·· তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃতপ্রায় হইয়াছে—তাহার চক্ষু দুটি ফুলিয়া রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে···পিঠের উপর জমকাল চুলগুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে।

স্ত্রী কহিল, বাছার একখানা ফটো তুলে রাখ গো। তা না হলে আমি কখনো বাঁচব না।

সুতরাং একখানি ফটো তোলা হইল। সেই নিমীলিত চক্ষু, বিবর্ণ মুখের বীভৎস ছবি। সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলিল, ঐটুকু মেয়ের আবার ফটো তোলা কেন?

স্ত্রী মেঝের উপর মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সুর সপ্তমে চড়াইয়া কাঁদিল, ওরে কমলি রে, তুই কেন অভিমান করে চলে গেলি রে?

কঠিন মেঝের আঘাতে কোমল কপাল ফুলিয়া উঠিল। তাহার সেই অশ্রান্ত ক্রন্দন, সেই আর্ত্তনাদ যেন মর্ত্তভূমি ত্যাগ করিয়া অন্তহীন ইথার-সমুদ্র বহিয়া স্বর্গের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ইহজগতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমরা নিষ্ঠুরের ন্যায় নিজেদের কর্ত্তব্য পালন

করিতে লাগিলাম। রমার বুক হইতে তাহার প্রাণের পুত্তলীকে মূর্খের বিক্রমে ছিনাইয়া লইলাম। নিশ্চেতন রমার শরীর স্পন্দিত হইল। সে কাতর ডাগর রাঙা চোখদুটি তুলিয়া মিনতি করিল, না—না—না। আমি যেতে দেব না।

মুহূর্তের জন্য আমার হাত অবশ হইল, সমস্ত কর্মশক্তি শিথিল হইল। ভবতারণ কহিল, সব মাটি করে ফেলছ খুড়ো। পুরুষমানুষের অত কোমল হলে চলে না। সরো দিকিনি।

রমা 'মাগো' বলিয়া মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িল। আমার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া আমাদের পা আঁকড়াইয়া ধরিল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ সোনামাণিকে আমার? আমি প্রাণ থাকতে যেতে দেব না। তার আগে আমার মরণ হোক গে।

তাহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না। অবকাশও আর ছিল না।

সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল। হাঁ, মার চেয়ে মেয়েটাকে বেশী ভালবাসত সরোজিনী—আমার সহধর্মিণী। আঘাতটা নাকি তাহাকেই বেশী করিয়া হানা দিয়াছে।

সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া সরোজিনী একটানা স্বরে শোক করিয়া চলিল। মুখে তাহার খাদ্য রুচিল না…রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হইল…মধ্যাহ্নে সাংসারিক কর্মে অবহেলা করিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ফটোখানি বুকে চাপিয়া কমলিকে কতরূপে কত ছলে এই ধরাতলে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার ক্লান্তিহীন শোকের গভীরতা দেখিয়া আমারই ভাবনা হইল। একদিন বলিলাম, সরো, তুমি একটা কথা শোন।

সে অশ্রু-সজল চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, কি?

বলিলাম, নিজেকে তোমার বাঁচতে হবে। বল, এমনি করে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করলে কি কমলি ফিরে আসবে? না আসতে পারে?

সরোজিনী অসহায়ের মত হতাশ স্বরে বিষণ্ণভাবে বলিল, সত্যি আর সে আসবে না?

বলিলাম, পাগল! কখন কি কেউ এসেছে? তুমি জেনেশুনে এমন ছেলেমানুষের মত কাজ কর। লক্ষ্মীটি আমার কথা শোন, দুটি খেয়ে নাও, কথার অবাধ্য হয়ো না।

কত সাধ্য-সাধনা করিলাম। আশপাশের কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া অজস্র সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তখন স্ত্রী বহুকষ্টে জীবনধারণের জন্যই যা দুটি অন্ন মুখে দিল। সরোজিনীর শোকাতিশয্যে সকলেই রমার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কমলির বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহার যে বত্রিশ নাড়ী মোচড়াইয়া অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা কোনরূপ প্রলাপেই আরোগ্য হইতে পারে না - তাহা ভাবিবার আমাদের ফুরসৎ ছিল না।

এই ঘটনার মাস দেড়েক পর একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া আমি স্ত্রীর পানে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাহার মুখ দুর্ভাবনায় শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া বসিতেই বলিল, একটা কথা বলি শোন। হেসে উড়িয়ে দিও না।

বলিলাম, কি কথা শুনি ?

সরোজিনী অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, আর একটা বাড়ী দেখ, এ বাড়ীতে আর একদণ্ডও থাকতে পারব না, মাইরি বলছি।

কথাটি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। বাড়ী-বদল সহজ ব্যাপার নয় কোন মতেই। পাঁচ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে অনড় অবস্থায় এইখানে রমাদের সন্নিকটে দুটি পরিবারের স্নেহবন্ধনে দিনযাপন করিতেছিলাম। আজ অকস্মাৎ সেই সুগঠিত পরিপাটী নীড় ভাঙ্গিবার আদেশ হইল। দুর্ব্বাসার অভিশাপ বোধ হয় এ আদেশের সহিত তুলনীয় হয় না। বিচলিত চিত্তে কহিলাম, অপরাধ ?

স্ত্রী তখন বিশদভাবে অপরাধ ব্যাখ্যা করিল। সে এক অভিনব অপরাধ। কেন জানি না, রমা কমলির ব্যবহৃত বিছানাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিছানার উপর শুইয়া কমলি নাকি নিশ্চিন্ত আরামে দেহত্যাগ করিয়াছিল। সরোজিনী তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। এমন কি ফটোতে পর্য্যন্ত তাহার ছবি উঠিয়াছে। রমা সেই বিছানাগুলি প্রতিদিন নাড়িয়া-চাড়িয়া কারণে অকারণে কাঁদিতে থাকে। সেগুলিকে সযত্নে পবিত্রভাবে বাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী কহিল, সত্যি বাপু, ও আমি কখনও সহ্য করতে পারব না। ছিটি রি-রি কচ্ছে। একটু বাছ-বিচার নেই। আমার ঠাকুর রয়েছে, দেবতা রয়েছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আজই তুমি বাড়ী ঠিক করে এস।

কথাটি শুনিতে যা বলিতে খুব সহজ। কহিলাম, রমারা কি মনে করবে সরো ?

সরোজিনী বলিল, তাই বলে তো আমি ইহপরকাল খোয়াতে পারি না। জেনেশুনে পাপ করি কি করে বল।

বলিলাম, কমলিকে তুমি না রমার চেয়ে বেশী ভালবাস ? আড়াই টাকা দিয়ে তো ফটো তুললে !

সরোজিনী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, ওগো, দোহাই তোমার, আর দগ্ধে মেরো না। এই নাও কমলির ফটো। বেঁচে থাকতে তো একদিনও বাছাকে আমার একটুও ভালবাস নি। মরে গিয়েও তার রেহাই নেই।

কথার শেষে সে কমলির ফটোখানি নিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাতাসে ভর করিয়া সেই ফটো দূরে উড়িয়া গেল।

অগত্যা আমায় সে বাড়ী অচিরেই ত্যাগ করিতে হইল। রমাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। জানিয়া শুনিয়া তো আর পাপ করিতে পারি না। আচার-বিচার আগে, না আগে ভালবাসা !

আশ্চর্য্য মানুষ !

বাঁশি

আজও আবার সেই ভাঙা বাঁশিটা লইয়া গোল বাধিল। বহুদিনের একটা পুরাতন বিবর্ণ পিতলের বাঁশি। মুখের দিকটা খানিক ভাঙিয়া গিয়াছে, ছিদ্রগুলি আর নিখুঁত হইয়াও নাই, আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনায় ফেলিয়া দিলেই হয়। এমন একটা পুরানো বাঁশি ছোট বউ কেন এমন আঁকড়াইয়া থাকে, একথা বহুবার ভাবিয়াও সুলেখার শাশুড়ী কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। প্রায়ই এই বাঁশিটা লইয়া গোল বাধে। আর লক্ষীছাড়া হতভাগা ছেলেটাও যদি কথা শোনে—না, ঐ বাঁশিই তার চাই।

আজও গোল বাধিল। সুলেখা অনেক যত্নে, টুলের উপর দাঁড়াইয়া অনেক কষ্টে বাঁশিটাকে খুব উঁচুতে তুলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। খোকা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে এবং ঘরের মেঝেতে বসিয়া অবাধ্য কাঠের ঘোড়াকে তাহা দ্বারা সজোরে আঘাত করিতেছে।

সুলেখা ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ভাবিল কিছু বলিবে না। কিন্তু কেমন একটা তীব্র বেদনা তাহার সমস্ত মনের গহনে ম্লান হইয়া উঠিল। নিকটে এবং দূরে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে কিসের এক কল্যাণময় সুর যেন শ্রান্ত গতিতে বাজিতে লাগিল। করুণ সুর কিন্তু সজীব।

সুলেখা খোকার নিকট আগাইয়া গেল। গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আস্তে আস্তে বলিল: তোকে একটা নূতন বাঁশি এনে দেব···

খোকা জবাব দিল না। ঘোড়া কিছুতেই চলিতেছে না, তাহা লইয়া সে ব্যস্ত। সে ঘোড়ার উপর কয়েক ঘা লাগাইয়া বলিয়া—চল ঘোড়া। চল, হ্যাট—

সুলেখা বলিল—লক্ষীটি! দে।

মুখ ফুলাইয়া খোকা বলিল—না। এবং এই 'না' বহু চেষ্টায়ও 'হাঁ'তে পরিণত হইল না। বাঁশির এই অযত্ন সুলেখা সহিতে পারে না···

হাত হইতে বাঁশিটা টানিয়া লইল—তোকে পয়সা দেব। দে।

খোকা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু সুলেখারও যেন আজ কি রকম এক রোক চাপিয়া গিয়াছে: বাঁশি তার চাই, চাই-ই। সে খোকার গালে অকস্মাৎ রাগের বশে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া গোটাকতক চড় মারিয়া বসিল, হতভাগা লক্ষীছাড়া ছেলে, কথা শোনে না! কী হবে তোর এ ভাঙ্গা বাঁশি নিয়ে? সেদিন কিনে দিলাম—সেটায় হবে না, এটা চাই। লক্ষীছাড়া!

বলিয়া সুলেখা খোকার পিঠে আরও কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল। চড় খাইয়া খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া মা আসিলেন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এই নিত্যনৈমিত্তিক উপভোগ্য ব্যাপারটা দেখিতে ছুটিয়া আসিতে ভুলিলেন না।

পিসী এ বাড়ীতে বহুকাল ধরিয়া আছেন এবং বড় বৌয়ের দিকে টানিয়া মনরক্ষা করিয়াই চলিতে অভ্যস্ত।

পিসী বলিলেন, তোমার যে কবে জ্ঞানগম্যি কিছু হবে, তা এতটা বয়স হলেও আমি বুঝলাম না ছোট বউ।

সুলেখা কথা কহিল না। চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বড় বৌ আজ অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন। ছোট বৌ সুলেখাকে অত্যন্ত স্নেহ করিলেও এবং তাহাকে ছোট বোনের মত দেখিলেও, খোকার পিঠের দাগগুলি দেখিয়া যার হৃদয় সহসা কাঁদিয়া উঠিল। তিনি টান মারিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া বাঁশিটা বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

সুলেখা আপত্তি করিল না। একটা প্রতিবাদও তুলিল না। যেমন ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল ঠিক তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সমস্ত চোখে মুখে এক নিদারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল। বর্ষার দিনে সমস্ত আকাশ যেমন করিয়া মেঘ-ভারাক্রান্ত হইয়া সজল নয়নে চুপ করিয়া থাকে, তেমনি গাঢ় বেদনায় সে একান্ত নিরুপায়ের মত চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত আকাশ ভরিয়া কালো আবছা অন্ধকার নামিয়া আসিল। দূরের গাছটার পাশ দিয়া সূর্য্যদেব নামিয়া যাইতেছেন: সব কিছুর মধ্যে আজিকার মতো বিদায়ের ধ্বনি।

সুলেখা ছাদে আসিয়া ছাদের আলিসা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ যেন কিছু ভাল লাগে না। এই পরিপূর্ণ সন্ধ্যা, এই মিষ্টি সুন্দর হাওয়া, এই আলো, এই বাতাস—সব কিছু যেন তিক্ত বেদনায় ভরিয়া গিয়াছে। বাতাসে রোজকার মতো আছে সেই সুর, সেই ছন্দ; তবু যেন ভালো লাগে না। হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী যেন কিসের আবাহনে আবার নিবিড় হইয়া উঠিল; বিগত জীবনকে সে কত ভাবে কত দিক দিয়া ভুলিতে চাহিয়াছে, কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে সযতনে নিয়োজিত রাখিবার কত প্রচেষ্টাই না সে দিনরাত করে—তবু পারে না। ঐ বাঁশিটাই যেন তাহাকে সজোরে তাহার গত জীবনের মধ্যে লইয়া আসে।

সুলেখা ছাদ হইতে সেই বাঁশিটার দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা ইটের উপর বাঁশিটা চুপ করিয়া শুইয়া আছে। সুলেখার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। মনে ভাবিল: ভালই হইল। ঐ অলুক্ষণে সর্ব্বনাশা বাঁশিটাই যত নষ্টের গোড়া; ওটাই কিছুতেই তাহার বিগত জীবনকে ভুলিতে দেয় না। ভালই হইল।

কিন্তু তবু যেন কিসের এক নিরবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ণ সুর তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে। সে সব কিছু ভুলিয়া যায়।

মনে পড়িতে লাগিল সেই দিনের কথা, যখন এ গৃহে প্রথম সে আসে। বয়স আর তখন কতই বা হইবে ওই বছর পনের বা ষোল—বা তারও কম।

স্বামীকে মনে পড়ে। মনোজ যেন আজও তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সুন্দর, গৌর

চেহারা। বনোজ : তার স্বামী। তার স্বামীকে মনে পড়িয়া যায়।

আরও ধীরে ধীরে অনেক কথাই তার মনে পড়িতে লাগিল। এই বনোজ কি ছুইুই না ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা তাহার খোঁপা খুলিয়া দুইুমি করিয়া এমনি হাজারো রকমের কী বিরক্তিই না করিত। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া সে বলিত, সুলেখার মনে পড়িতে লাগিল—তোমাকে একটি মুহূর্ত পাওয়া যায় না, কেমন মেয়ে তুমি?

সুলেখা বলিত, দিনরাতই ত কাছে আছি, তবু পাও না?

না পাইনে ত। এই বুঝি দিনরাত?

সুলেখা অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত।

এই বুঝি দিনরাত কাছে থাকা, বনোজ বলিত, হিসেব করে দেখ ত আজকে কতক্ষণ তুমি কাছে ছিলে! সেই ভোরে মিনিট খানেক—দুপুরে তিন সেকেণ্ড, আর এই এখনই, যাই আর যাই।

সুলেখা প্রতিবাদ করিত না। কারণ, করিয়া লাভ নাই। বলিত, মা বসে আছেন সেই কখন থেকে, আর-আর-ওরা সবাই বা কি ভাববেন, যাই।

এমনি কতো টুকরো টুকরো কাহিনী মনে পড়িতে লাগিল।

কিন্তু বনোজের একটি প্রিয় জিনিস ছিল—বাঁশি বাজানো। তন্ময় হইয়া সে বাঁশি বাজাইত এবং এই একটিমাত্র সময়েই সে সব কিছু ভুলিয়া যাইত—সংসার মুছিয়া যাইত দৃষ্টির সম্মুখ হইতে, সমস্ত কিছু সুরের ছন্দে নাচিয়া বেড়াইত। কী সুন্দর বাজাইতেই না সে জানিত। সুরের উপর সুর সৃষ্টি করিত এক অপরূপ রূপ-জগতের, যেখানে আর কাহারও স্থান ছিল না, সুলেখারও নয়। এ সময় সুলেখা আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেও সেই দিকে তাহার বিন্দুমাত্র খেয়াল হইত না—হয়তো চোখ পড়িয়াও পড়িত না।

এই সুরের রাজ্যে বনোজ ছিল একান্তই একক। ইহার গণ্ডী পার হইয়া সুলেখাও কখনও সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এইখানেই ছিল তার দুঃখ। সে স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইত, বনোজ একবার ফিরিয়াও তাকাইত না।

সুলেখার রাগ বাড়িয়া যাইত। সে হয়তো টান মারিয়া বাঁশিটি তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইত। দু-একবার একটু আপত্তি তুলিয়া বনোজ চুপ করিয়া থাকিত। সুলেখাকে সে এতই ভালবাসিত যে অত্যন্ত রাগ হইলেও কখনও তাহাকে বাধা দিতে পারিত না, বলিত, সু—তুমি অমন করে কখনও বাঁশি কেড়ে নিও না আমার কাছ হতে।

সুলেখা জয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিত, বাঁশি তুমি আর কখনও বাজাতে পারবে না।

ম্লান ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া সে বলিত : কেন?

সুলেখা রাগিয়া বলিত, কেন দিনরাত শুধু বাঁশি বাজাবে তুমি? আমি কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি!

বনোজ কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইত। আদর করিয়া বলিত, এই কথা! বেশ ত। এসো।

বলিয়া এমন দুষ্টুমিই করিতে আরম্ভ করিত যে বাধ্য হইয়া সুলেখা বলিত, তোমার কেবল দুষ্টুমি, ছাড়ো।

বাঃ! তোমার সাথেও দুষ্টুমি করতে পারবো না?

না।

বেশ, বনোজও হাত পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া নির্ব্বিকার হইয়া বসিত। বেশ, না করলাম, বলিয়া বাঁশিটি হাতে তুলিয়া লইত।

ধাঁ করিয়া সুলেখা আবার তাহা কাড়িয়া লইয়া বলিত, না, এখন থাক বাজানো। বেশ না হয় দুষ্টুমিই কর, কিন্তু দেখ ত এই সন্ধ্যাবেলা—শেষে কে কি বলে বসবে!

বনোজ আদর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিত, কেউ কিছু বলবে না।

এমনি কত কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল, সে-সব কথা এতো ছোট, এতো ক্ষুদ্র যে কোনটিই মনে রাখিবার মতো নয়—তবুও প্রত্যেক কাহিনী, প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি ছন্দ যেন কতো চেনা, কতো পরিচিত।

ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও যেন ভোলা যায় না। স্মৃতির কোন্ অতল দেশ হইতে আপনিই উঠিয়া আসে। বসন্ত ঋতুতে যেমন করিয়া দক্ষিণের বাতাস সমস্ত কিছু ভরাইয়া দিয়া যায়, তেমনি করিয়া সেই সব গত কাহিনী মনের কোন্ গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিয়া সুরে ছন্দে, গানে এবং প্রাবল্যে, উত্তেজনায় আর আনন্দে তাহাকে মাতাইয়া দিয়া যায়, তাহাকে বিভোর করিয়া তোলে। সে আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেই রূপের মোহে, সেই সুরের ধ্বনিতে, সেই ছন্দের বিচিত্র বর্ণে এবং গন্ধে।

ভুলিতে চাহিলেও ভোলা যায় না।

এমন করিয়া কত কি সুলেখা ভাবিতেছিল।

নীচ হইতে মা ডাকিলেন, বৌমা!

বড় বৌ ডাকিলেন, ও ছোট, কোথায় তুই? নীচে আয়।

সুলেখা ডাক শুনিয়া নীচে আসিল। বড় বৌ বলিলেন, তোমার জন্যেই খোকাটা অত বাড় বেড়েছে, এখন বোঝ মজাটা। একদিন তুমি না খাইয়ে দিলে চলবে না, ভাত নিয়ে কতক্ষণ সাধাসাধি হলো। খাবে না।

সুলেখা কোন কথা বলিল না, খোকাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। ইহাকে খাওয়ানো একটা মহাযুদ্ধ জয় করা হইতে কম নয়। এবং একমাত্র সুলেখাই তাহা পারে। খাইতে বসিয়া অন্ততঃ সহস্র আবদার রক্ষা না করিলে সে কিছুতেই খাইবে না। সুলেখা ইহা জানে, কিন্তু আজ তার কোন দিকে ভাল লাগিল না। বলিল, বুড়ো ছেলে এখনও নিজে খেতে শেখেনি, পারব না আমি তোকে রোজ খাওয়াতে, খা!

সুলেখা বুঝিতে পারিল আজ খোকার ভাল করিয়া পেট ভরে নাই। কিন্তু কোন কথা

বলিল না, রাগ করিয়া এমন করিয়াছে একথা মিথ্যা কেন ভাল লাগিল না। যাকে এক মুঠা বেশী খাওয়াইবার জন্ত উদ্বেগের আর তাহার অন্ত থাকে না, আজ তাহাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিতেও যেন কেমন এক বিশ্রী আলস্ত। মনের সমস্ত কিছু ভরিয়া শুধু বনোজ। শুধু মাত্র বনোজ, আর কেউ নাই। এই পৃথিবী, এই বিরাট জগতের যা কিছু সব আজ নিঃশেষে এই বিধবা তরুণীটির নিকট হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র 'বনোজ' আজ সেখানকার অধীশ্বর, কেউ আর কোথাও নাই। সব ফাঁকা, সব খালি।

খোকার খাওয়া-পর্ব্ব শেষ হইলে সুলেখা সংসারের ছোটখাটো কাজ করিল। আজ কাজ করিতেও কেমন এক বিতৃষ্ণা। দেখিল, মায়ের সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত এখনও হয় নাই। খোকার এবং অন্তান্তের বিছানা খালি পড়িয়া আছে, চাদর পাতা হয় নাই। বড় ঠাকুরের আসিয়াই গামছা চাই, অথচ র‍্যাকে গামছাটা পর্য্যন্ত ঝোলান নাই।

এসব কাজ সুলেখাই করে, এবং করিতে না পারিলে দুঃখিতও হয়। কিন্তু আজ কিছু ভাল লাগিল-না, কেমন যেন একটা অবসাদ, সমস্ত মাথার ছিদ্র দিয়া যেন অন্ত কাহারও কথাই মনে ঢুকিতে লাগিল।

ছোট ননদ 'মিনু' আসিয়া বলিল—বৌদি, আমার পড়াটা একটু দেখিয়ে দেবে চল না।

চল, বলিয়া তাহাকে পড়াইতে বসিল।

কিন্তু আজকে যেন কিছু ভাল লাগে না, পড়াইতে পড়াইতে অকস্মাৎ কখন মনে পড়িয়া গেল—সন্ধ্যা হইলেই বনোজ ঐ বাঁশিটি লইয়া বাজাইতে বসিত, আস্তে আস্তে সুর তুলিত গানের।

মিনু বলিল, তার পর কি হল বৌদি, কি হবে বলে দাও না।

বৌদি বলিল, বাঁশির ইংরাজী তাও জানো না—

মিনু বলিল, বা, তা বুঝি জিজ্ঞেস করছি?

বৌদির মন অবচেতনা হইতে ফিরিয়া আসিল। বলিল, আজ থাক বোন। আজ ভাল লাগছে না। ধীরা কই রে?

কে, বড়দি?

হাঁ।

সে ত আর স্কুল হতে আজ বাড়ী আসেনি।

কেন রে?

ওদের আজ প্রাইজ না কি, বললাম আমাকে নিয়ে যেতে—নিলে না।

বৌদি চুপ করিয়া রহিল।

মিনু বলিল, আজ ওরা হোস্টেলে থাকবে, কাল সকালে আসবে।

আচ্ছা।

ধীরা থাকিলে তাহার সহিত গল্প করিয়া কিছুটা সময় তবু কাটানো যাইত। আজ তাহারও উপায় রহিল না, অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় তখন অমনি করিয়াই হয়।

রাত্রি এদিকে অনেক হইয়া গিয়াছে। আকাশে এক খণ্ড চাঁদ, তাহারই শুভ্র আলোকে সকল কিছু রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। সামনের বাড়ী-ঘর, দূরের ঐ প্রান্তর সমস্ত কিছুর উপর চাঁদের মিষ্টি আলো। কোমল স্পর্শ।

সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। রাতও কম হইল না। সুলেখার চোখে ঘুম নাই। ঘুম যেন এ রাজ্য হইতে কতদূরে পলাইয়া গিয়াছে—ঘুম নাই। সুলেখা জানালার নিকটে দাঁড়াইল। কিসের যেন একটা মিষ্টি শব্দ কতদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। দূরের ঐ পল্লবিত বনানীর শেষী পার হইয়া, ছোট ঝরণাধারাগুলিকে পাশে রাখিয়া কোথা হইতে যেন একটা বাঁশির শব্দ আসিয়া আসিতে লাগিল।

জানালা ধরিয়া সুলেখা চুপ করিয়া রহিল।

আকাশে শ্বেত-শুভ্র অপরূপ জ্যোছনা, রূপার মত ঝক ঝক করিয়া বিছাইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া গলাইয়া আসিয়াছে খানিকটা তাহার ঘরের মধ্যে, এমনি কত রজনীতে কতদিন তাহারা দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়াছে, বাঁশি লইয়া ঝগড়া হইয়াছে। এমনি করিয়া কত বসন্ত, কত বর্ষা, কত গ্রীষ্ম তাহাদের নিকট দিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া গিয়াছে—খুশী করিয়া, হাসি দিয়া, কত ভাবে। কিন্তু তারপরের কথা ভাবিতেও সুলেখার ভয় হয়।

তখন বৈশাখ মাস। এমনি একটা সময়ে বনোজের সর্দ্দি হঠাৎ বসিয়া যায়। তা লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি। কিন্তু টানাটানিতে এক পক্ষই জিতিতে পারে—জয় হইল বিধাতার। অসুখের সময় বনোজ বাঁশি বাজাইতে চাহিত। ডাক্তারদের বারণে হইয়া উঠিত না। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে বনোজ সুলেখাকে কাছে টানিয়া নেয়। বলে, আমার ত সময় হইয়া আসিল। বিদায় দাও, সু!

চোখের অশ্রু মুছিয়া সুলেখা কি বলিতে চাহিতেছিল, পারে নাই।

মৃত্যুর মত হাসি হাসিয়া বনোজ বলিয়াছিল, যদি কিছু হয়—এ বাঁশিটি তুমি রেখে দিও। ওর চেয়ে প্রিয় আমার কিছু নেই।

কাঁদিতে কাঁদিতে সুলেখা বলিয়াছিল—অমন কথা বলবে ত, আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি পারব না রাখতে তোমার বাঁশি।

বনোজ আর কিছু বলে নাই। শুধু বলিয়াছিল—ওকে রেখে দিও।

তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গিয়াছে আজ তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। সুলেখা সে কথা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠে। মাত্র তিন বছর স্বামীর সহিত বাস করিবার পরই তাহার সব ঘুচিয়া গেল : নারী যাহা লইয়া গর্ব্ব করে, সে তাহাকে হারাইল।

তারপর কত বছর কাটিয়া গিয়াছে। কত বর্ষা, কত বসন্ত ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। গন্ধভরা উতলা বাতাসে কত দক্ষিণের গানই না রূপের মাধুর্য্যে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই যেন মস্তবড় একটা দীর্ঘ ফাঁক। কি যেন হারাইয়া গিয়াছে। কিসের যেন অভাবে সমস্ত আলো সমস্ত হাসি একটা বিরাট মিথ্যা হইয়া তাহার নিকট দেখা দেয়।

কিন্তু প্রত্যহ রাতে যেন কে আসিয়া ঐ বাঁশিটি বাজায়। সুলেখা ঘুমাইয়া পড়িলে যেন কাহার সজীব হস্তে বাঁশিতে সুর আরম্ভ হয়। জাগিয়া থাকিলে বাঁশি বাজে না। কিন্তু ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া প্রত্যেক রাত্রে সে ঐ বাঁশির শব্দ শুনিতে থাকে। তাহার বৈধব্য-জীবনের মধ্যে এই একটি মাত্র সান্ত্বনা। যাহা লইয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে।

আজ তাহার মনে হইতে লাগিল কতদূর হইতে একটা বাঁশির করুণ সুর যেন ভাসিয়া আসিতেছে। কি করুণ সে সুর! প্রতিটি রেশের মধ্য হইতে কে যেন শান্ত কণ্ঠে বিনয় করিয়া বলিতেছে, আমায় তুমি তুলে নিলে না? তুলে নাও, নাও।

সুলেখার সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই। ওদিকে বাঁশি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, আমায় তুলে নাও তুমি, তুলে নাও।

সুলেখা কি করিবে, অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল। তাহার পর ধীরে ধীরে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিল। খিড়কীর দরজা খুলিয়া প্রাচীরের নিকটে আসিয়া সেই বাঁশিটির নিকট ধীরে ধীরে আগাইয়া গেল। কে এক ছায়ামূর্তি যেন বাঁশিটি হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সুলেখা কেমন বিহ্বল হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

তারপর কিসের এক উন্মাদনায় আগাইয়া গেল এবং সেই ছায়ামূর্তির হাত হইতে বাঁশিটি তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। ছায়ামূর্তি খুশী হইয়া উঠিল যেন, কিন্তু কিছু বলিল না।

পাঁচুমামার বিয়ে

বাবা যখন মারা গেলেন, তখন দাদার বয়স উনিশ, আমার সতেরো। অবস্থা আমাদের ছিল দিব্বি সচ্ছল, বড় বড় পাঁচ গোলা ধান তখন বাড়ীতে, এক একটা গোলায় দু পৌটি আড়াই পৌটি ধান মজুত। জমিজমার আয়ও বাষিক হাজার দুই টাকার কম নয়, এ বাদে ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা ও মায়ের গায়ে সোনার গহনাও বেশ ছিল। আর ছিল গ্রামের মধ্যে প্রচুর মান, খাতির, রবরবা নাম-ডাক।

রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় লোয়ার প্রাইমারী পড়বার সময় ইতিহাসে পড়েছিলাম, কে একজন বাংলার সুলতানের পুত্র "পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন তাঁহার রাজকোষে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, তিন লক্ষ হস্তী, পাঁচ লক্ষ অশ্ব, দশ লক্ষ পদাতিক ও বিশ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য আছে".....অতএব তাঁর মাথা ঘুরে গেল এবং তিনি দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করে বসলেন। আমাদেরও হলো তেমনি অবস্থা।

মা ছিলেন নিরীহ ভাল মানুষ, ঠাকুরমা পিতৃহীন নাতিদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ, সুতরাং আমাদের মাথার ওপর কড়া শাসন করবার বা রাশ টেনে ধরবার তো কেউ ছিল না —এ অবস্থায় আমাদের মুণ্ড ঘুরে যাবে, এ আর বিচিত্র কি?

দাদাই অগ্রজের অধিকারে পথ দেখালেন প্রথম। আগে মুণ্ড ঘুরে গেল তাঁরই।

সে ইতিহাস রীতিমত বিচিত্র।

কাঁচড়াপাড়ার কাছে বন্দিপুর গ্রামে আমার এক দূর সম্পর্কের মামা থাকতেন, তাঁকে পাঁচুমামা বলে আমরা ডাকতুম। বাবা বেঁচে থাকতে তিনি দু-একবার আমাদের বাড়ী যাতায়াত করেছিলেন বটে, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে তাঁর যাতায়াত, বিশেষ করে দাদার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা যেন হঠাৎ খুব বেড়ে গেল।

পাঁচুমামা দাদার চেয়েও চার-পাঁচ বছরের বড়। কাজেই আমি পাঁচুমামাকে খুব সমীহ করে চলতুম। পাঁচুমামাও আমার চেয়ে দাদার সঙ্গে বেশী করে মিশতো। একবার পাঁচুমামা এসে দাদাকে সঙ্গে করে বন্দিপুর নিয়ে গেল।

বন্দিপুর থেকে দিন পনেরো পরে ফিরে এসে দাদা ঠাকুরমাকে বল্লেন, ঠাকুমা, আমার দুশো টাকা বড় দরকার এখুনি। কলাই মুগের ব্যবসা করছি, পাঁচুমামা সস্তায় মাল বাঁধাই করছে, চাষাদের দিতে হবে—টাকাটা এখুনি চাই। মোটা লাভ হবে দু'মাস পরে। ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা কত ছিল তা আমার জানা ছিল না, তবে নগদ টাকা যে মন্দ ছিল না—এটা দাদাও জানতেন, আমিও জানতাম। ঠাকুরমা টাকাটা দিয়ে দিলেন, দাদা টাকা নিয়ে মাল খরিদ করতে চলে গেলেন।

দিন কুড়ি পরে পাঁচুমামাকে সঙ্গে নিয়ে দাদা আবার এসে শ' দুই টাকা চাইলেন। মাল যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে সস্তায়। পাঁচুমামার বাড়ী মাল গোলাজাত করা হচ্ছে, টাকার দরকার সেজন্যেই।

পাঁচুমামাও দাদার কথা সমর্থন করলেন। মাল সস্তার মুখে বেশী পরিমাণে খরিদ করে রাখতে পারলেই লাভ। টাকাটার দরকার বটে।

ঠাকুরমা জিগ্যেস করলেন—কত মাল কেনা চলো?

পাঁচুমামা বল্লে—তা দুশো মণের ওপর। এই টাকাটা পেলে আরও দুশো মণ খরিদ করা চলে। মণ পিছু আট আনা করে ধরলেও দুশো টাকা লাভ।

দিলেন টাকা ঠাকুরমা।

দাদা ও পাঁচুমামা টাকা নিয়ে চলে গেল—এরপরে মাস খানেক তাদের আর কোন পাত্তা রইল না। ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে একখানা চিঠিও লেখালেন—তারও উত্তর এল না।

চিঠির উত্তরের বদলে আরও দিন দশেক পরে এলেন পাঁচুমামার এক ভগ্নিপতি নারাণবাবু। নারাণবাবু বৃদ্ধ ব্যক্তি, বন্দিপুরে তারও বাড়ী। আমি তাঁকে কখনও আমাদের বাড়ী আসতে দেখিনি।

নারাণবাবুকে হঠাৎ আসতে দেখে বাড়ীসুদ্ধ সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। দাদা ভালো আছেন তো? ব্যাপার কি?

নারাণবাবু হাত-পা ধুয়ে সুস্থ ঠাণ্ডা হয়ে ঠাকুরমাকে বল্লেন—মা, আপনি পটলকে কত টাকা দিয়েছেন এ পর্য্যন্ত?

—চারশো টাকা।

নারাণবাবু অবাক হয়ে বল্লেন—এত টাকা কেন দিলেন? কি বলে টাকা নিয়েছিল আপনার কাছ থেকে?

ঠাকুরমা বল্লেন,—কেন বলো তো বাবা এসব কথা জিগ্যেস করছো? সে তো মুগ কলাইএর ব্যবসা করবে বলে টাকা নিয়েছে। কেন, পাঁচুও তো সেবার এসে ওই কথাই বলে গেল।

নারাণবাবু রাগে জ্বলে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন—পাজী বদমাইস্, ছুঁচো!...সেই রাস্কেলটাই তো যত নষ্টের গোড়া। অত বড় বদমাইশ কি আর আছে নাকি? সেই তো পটলটাকে ভালমানুষ পেয়ে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। ওই জন্যেই আমার সামনে বেরোয় না। ব্যবসা না মুণ্ডু। টাকা নিয়ে দুলে-পাড়ায় রাজি দুলেনী বলে এক মাগী আছে, তারই ওখানে দুজনে যাতায়াত করে—এর মধ্যে বোধ হয় সব টাকাই তার পাদপদ্মে ঢেলেছে। ব্যবসা!

মা আর ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। দাদা যে এমন ব্যাপার করতে পারে এ সবারই ধারণার অতীত।

নারাণবাবু বল্লেন—আমিই কি আগে ছাই জানতাম। জানলে এমনতরো হয়? আমার সামনে তো দুজনের কেউ-ই বড় একটা আসে না, পরম্পরে শুনলাম এই ব্যাপার চলছে। শুনলাম খুব টাকা ওড়াচ্ছে। জোড়া জোড়া শাড়ী আসছে রাণাঘাটের বাজার থেকে মাগীর জন্যে। আজ থাবার, কাল থাগড়াই বাসন। বোধ হয় মদও ধরেছে। তাই ভাবলাম আপনাকে একবার কথাটা জিগ্যেস করা দরকার যে, আপনি টাকা দিয়েছেন কিনা। তাই আজ এলুম।

ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবার বহুকষ্টে উপার্জ্জন করা পয়সা—ছেলেরা সব মূর্খ ও নাবালক—যা কিছু আছে, সংসারের অসময়ে কাজে লাগবে বলেই আছে। এখনও আমার দুই বোনের বিয়ে দিতে বাকী! এ অবস্থায় বিধবার পুঁজি সামান্য টাকার মধ্যে চারশো টাকা এক দুলে মাগীর পেছনে এভাবে ওড়ানো?

সমস্ত রাত পরামর্শ করার পরে ধার্য্য হলো যে, পরদিন সকালে নারাণবাবু আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন বন্দিপুরে এবং কালই দাদাকে আমি ঠাকুরমার অসুখ হয়েছে এই কথা বলে বাড়ী ফিরিয়ে আনব।

বন্দিপুর যেতে হয় মদনপুর স্টেশনে নেমে। মাঠের মধ্যে দিয়ে ক্রোশ দুই হেঁটে তো বিকেলে বন্দিপুর পৌছানো গেল। বাড়ী থেকে খেয়েই বেরিয়েছিলুম। পাঁচুমামা বাড়ীতে নেই, দাদাও নেই—শুনলাম তারা কানসোনার বাজারে গিয়েছে।

আমি পাঁচুমামার বাড়ীর সামনে একটা বেলগাছ তলায় বসে আছি, কে একজন মোটাসোটা কুচকুচে কালো স্ত্রীলোক সামনের ঘর দিয়ে মেটে কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল—নারাণবাবু তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—ওই ছাখো, ওই বেটি

সেই রাজি দুলেনী—ওরই পাদপদ্মে তোমার দাদা সব টাকা ঘুচিয়েচে।

একটু পরে দাদা ও পাঁচুমামা বাড়ী ফিরল। আমাদের দেখে দুজনেই প্রথমটা অবাক হয়ে যেন থতমত খেয়ে গেল, তারপর দাদা জিগ্যেস করলে—কিরে নগা, কি মনে করে?

নারাণবাবু বল্লেন—ও এসেছে তোমায় বাড়ী নিয়ে যেতে। তোমার ঠাকুরমার বড় অসুখ যে!

—অসুখ? কি অসুখ?

দাদা আমার মুখের দিকে চাইলে। দাদার হঠাৎ-ভয়-পাওয়া হঠাৎ-ম্লান মুখের দিকে চাইতে পারলুম না। বড় কষ্ট হলো, একবার মনে হলো, সত্য কথাটা বলে ফেলি। কিন্তু তা হলে দাদা যদি বাড়ী না যায়?

সেই রাত্রেই দাদাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

বাড়ী এসে দাদা খুব বকুনি খেলে ঠাকুরমা ও মায়ের কাছে। তার উত্তরে সে নারাণ-বাবুকে গালমন্দ দিয়ে যা-তা বলে গেল। কে বলেছে সে সর্বে কেনে নি? এখনও বিশ মণ সর্বে ঘরে মজুত রয়েছে—আর সব মাল চাষাদের ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে, দরকার হলেই,—রাজি দুলেনী কে? রাজি দুলেনীকে দাদা চেনেও না। নারাণবাবুর মত কুটিল, ধড়িবাজ লোক দুনিয়ায় আর নেই। তিনি টাকা ধার চেয়েছিলেন, দাদা দেয়নি, তাই তিনি দাদার বিরুদ্ধে এই সব মিথ্যে রটনা করে বেড়াচ্ছেন।

বলা বাহুল্য, মা বা ঠাকুরমা দাদার এসব কথা কিছু বিশ্বাস করলেন না। মাস খানেক পরে পাঁচুমামা আবার একদিন এসে হাজির আমাদের বাড়ীতে। ঠাকুরমা বল্লেন—পেঁচো শোন। হতভাগা, আমার যে এক রাশ টাকা চেয়ে পাঠালি পটলাকে দিয়ে ব্যবসা করবি বলে, কই ব্যবসার হিসেব দেখা তো আমায়? দেখি কোথায় গেল এতগুলো টাকা!

পাঁচুমামার মুখে চিরদিন তুবড়ি ছোটে। হাত পা নেড়ে সে বুঝিয়ে দিলে, টাকা ডোবানো তো দূরের কথা—আর মাস দুই পরে ঐ চারশো টাকায় অন্ততঃ দেড়শোটি টাকা লাভ দাঁড়াবে। তখন লাভে মূলে একসঙ্গে টাকাটা এনে দেবে এখন। পাঁচুর অদৃষ্ট খারাপ, সে যার জন্য চুরি করে—সেই নাকি পাঁচুকে চোর বলে। যাক্, তার জন্যে সে দুঃখিত নয়—আসল টাকাটা কোন রকমে ঠাকুরমায়ের হাতে তুলে দিতে পারলেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ততদিন পর্য্যন্ত রাত্রে ঘুম নেই তার।

পাঁচুমামার বক্তৃতায় ঠাকুরমার বিশ্বাস ফিরে এল। ফলে পাঁচুমামা আমাদের বাড়ীতে রয়েই গেল। দাদাকে এর আগেই সে নষ্ট করেছিল, এবার আমার পিছনে লাগল এবং অদ্ভুতভাবে সাফল্য অর্জ্জন করল। এমন কি, কিছুদিন পরে আমারই মনে হলো, আমি দাদাকে বুঝি ছাড়িয়েই যাই।

তখন আমার বিবাহ হয়নি—দাদার সবে হয়েছে। আমি নানা ছুতোয় ঠাকুমার কাছ থেকে টাকা আদায় করি আর পাঁচুমামার পরামর্শ মত খরচ করি। মহকুমা শহর ছিল নিকটেই। নানা ছুতোনাতায় মহকুমা গিয়ে আমি আর পাঁচুমামা প্রায়ই রাত্রে বাড়ী ফিরতুম না।

ধাপে ধাপে শেষে এতদূর পর্য্যন্ত নেমেছিলুম।

পাঁচুমামাকে সত্যি আমি অদ্ভুতকর্মা মানুষ বলে ভাবতাম। যেমন জানে ব্যবসা, তেমনি রাখে দুনিয়ার সব খবর ; যেমনি বোঝে মোকদ্দমা, তেমনি পারে ফুর্ত্তি করতে। পাঁচুমামার হাতে টাকাগুলি তুলে দিয়ে বলতাম, এর মধ্যে থেকে যা যা দরকার খরচ করো।

যত টাকাই দিই, তিন-চার দিনের মধ্যে সব খরচ করে ফেলে আবার আমার কাছে চাইতেন। বলতেন—কিন্তু, বুড়ীর হাতে মোটা টাকা আছে। তা তোমার দ্বারা কিছু যে হবার নয়, আমি বুড়ীর নাতি হলে দেখতিস।

মামার কাছে কখনো টাকার হিসেব নিইনি—অসীম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা ছিল আমার পাঁচু-মামার ওপরে। কিভাবে ও কোথায় সে সব টাকা ব্যয় হতো, সে কথা আর বলব না—তবে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে মাঘ মাস থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ শো টাকা পাখীর মত উড়ে গেল বেমালুম। ঠাকুরমা হাত গোটালেন, মায়ের গহনা বন্ধক পড়তে লাগল। এই অবস্থায় পাঁচুমামা একদিন তেওটা বন্দিপুরে বিশেষ কাজ আছে বলে চলে গেলেন, আর এলেন না।

মাস দশেক পরে একদিন শীতের রাত্রে মুড়িসুড়ি দিয়ে দালানে বসে আছি, এমন সময় পাঁচুমামা আমাদের বাড়ী এসে আবার হাজির।

আমায় বল্লেন—এই যে, ভাল আছিস নগা? পটলা কোথায়?

বল্লুম—দাদা ওপাড়ায় গাঙ্গুলি-বাড়ী গিয়েছে বোধ হয়। তার পরে, এতদিন কোথায় ছিলে মামা? এসো বসো—বড্ড শীত।

পাঁচুমামা দরজা ভেজিয়ে আমার কাছে এসে বসল। বলল—শোন্, একটা কথা বলতে এলুম তোদের। কাল এখানে এক ভদ্রলোক আসবে সকালের গাড়ীতে। যদি তোদের কিছু জিগ্যেস করে তবে বলবি, তোদের এখানকার বিষয়-সম্পত্তিতে আমার পাঁচ আনা অংশ আছে। বলতে পারবি তো? পটলা কোথায় গেল—তাকেও কথাটা শিখিয়ে রাখি।

কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে বল্লুম—কি, কি ব্যাপার মামা? কে আসবে?

ব্যাপার যা শুনলুম তা সংক্ষেপে এই। পাঁচুমামার বিবাহ, কাল তাকে দেখতে আসবেন মেয়ের বাপ নিজে। আসলে তো পাঁচুমামার কিছু নেই তেওটা-বন্দিপুরে, যা ছিল তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে অনেককাল। কিছু না দেখলে মেয়ে দেবেই বা কেন? মেয়ের বাপের নাম হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে, মদনপুরের কাছেই কি গাঁয়ে বাড়ী, গরীব অবস্থার লোক। তিনটি মেয়ে তাঁর, মেয়ে তিনটি অপরূপ সুন্দরী—এইটি বড়। পাঁচুমামা এই মেয়েটিকে দেখে নাকি পাগল হয়েছেন, বিয়ে যে কোন উপায়ে হোক হওয়াই চাই।

রাত্রে দাদা ফিরলে দাদাকে বলা হলো সব কথা। দাদা বল্লে—পাঁচ আনা অংশ কেন। আছে যদি জিগ্যেস করে?

—তবে বলবে তোমার বাপ আমার বাবার কাছে টাকা ধার নিয়েছিল—সেই দেনার দায়ে

সম্পত্তির অংশ বিক্রী করে যায়।

আমরা রাজী। কিন্তু ভদ্রলোক যদি গাঁয়ের আর কাউকে জিগ্যেস করেন? তবেই তো মিথ্যে কথা ফাঁস হয়ে যাবে; পাঁচুমামা সেকথাও ভেবে এসেছেন। গ্রামের যে ক'জন লোক আমাদের পয়সায় ফুর্তি করেন, যেমন হারু সান্যাল, ওপাড়ার আশু চক্কত্তি, এঁদের বয়েস আমাদের চেয়ে বেশী—এঁদেরও কথাটা বলে রাখতে হবে। আমরা বল্লে কেউ 'না' বলতে পারবে না। কাল মেয়ের বাপের সামনে তাঁদের হাজির করতে হবে। তাঁরাও আমাদের কথায় সায় দেবেন।

পরদিন সকালে আমাদের দলের লোক যাঁরা, তাঁদের একথা বলা হলো। তাঁরা সকলেই রাজী হলেন, না হয়ে উপায় ছিল না।

দুটোর কিছু আগে মেয়ের বাপ হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে এলেন। ছেলে দেখে পছন্দ করলেন; তারপর ছেলের কি আছে না আছে সে কথা উঠল।

পাঁচুমামা বল্লে, আমাদের জমিজমার সে পাঁচ আনার মালিক। আমরা তাতে সায় দিলাম। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে নিতান্ত সরল, গ্রাম্য লোক এবং ভাবে মনে হলো নিতান্ত গরীব। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারের কিছু বোঝেন না। কেবল একবার জিগ্যেস করলেন—আপনারা তো ভাগ্নে, ভাগ্নের সম্পত্তিতে আপনাদের মামার অংশ কি করে এল?

এর উত্তরে বাকপটু পাঁচুমামা একটি যে মিথ্যা কথা বানিয়ে বল্লে, আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম—আমাদেরই মনে হলো, পাঁচুমামা যা বলছে তাই বুঝি সত্যি। কবে আমার বাবা পাঁচুর বাবার কাছে টাকা ধার করেছিলেন, সুদে আসলে তা কত টাকা দাঁড়ায়, তারই বদলে আমার বাবা পাঁচুর বাবাকে পাঁচ আনা সম্পত্তির উপস্বত্ব দিয়ে যান।

যে কোনো বিষয়ী বুদ্ধিমান লোক হলে এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতো, কিন্তু হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের মনে কোন সন্দেহ জাগল না। আমাদের এখানে আহারাদি করে বৈকালের দিকে বাঁড়ুয্যে মশায় চলে গেলেন। যাবার আগে পাত্র আশীর্বাদের দিন স্থির করেই গেলেন।

উভয় পক্ষের আশীর্বাদের পরে বিবাহের দিন স্থির হলো। নির্দিষ্ট দিনে আমরা সবাই বরযাত্রী গেলাম। বলা বাহুল্য, পাঁচুমামার চালচুলো পর্য্যন্ত ছিল না—জমিজমা থাকা তো দূরের কথা—সুতরাং আমাদের বাড়ী থেকেই বর বিয়ে করতে রওনা হলো এবং কথা হলো যে বউ নিয়ে আবার পাঁচুমামা আমাদের বাড়ীতে ফিরে আসবে।

কনের বাপের বাড়ী একখানা মাত্র খড়ের ঘর, তারই দাওয়ায় সম্প্রদানের আসর, কারণ বর্ষাকাল, বৃষ্টি যখন তখন আসতে পারে। বরযাত্রী থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিল কিছু দূরে এক প্রতিবেশীর চণ্ডীমণ্ডপে।

কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুবই কম, সবসুদ্ধ জন পনেরো। বাড়ীর ভিতরের উঠানে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তারই তলায় আমরা বসে গেলাম। লগ্ন ছিল বেশী রাত্রে।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের অবস্থা কত খারাপ তা বোঝা গেল একটু পরেই। তিনি নগদ বরপণ স্বরূপ একুশটি মাত্র টাকা দিতে চেয়েছিলেন, এখন বিবাহ সভায় দেখা গেল তিনি মাত্র এগারোটি টাকা থালার উপর সাজিয়ে রেখেছেন। বরকর্ত্তা ছিলেন আমাদের গ্রামের দাশু চক্রবর্ত্তী, প্রবীণ লোক বলে তাঁকেই আমরা সঙ্গে নিয়েছি কর্ত্তা সাজিয়ে, নইলে পাঁচুমামার তরফ থেকে বরকর্ত্তা হবার কোন মানুষ নেই তো!

দাশু চক্রবর্ত্তী আমাদের উপদেশ মত বল্লেন—একুশ টাকার কথা ছিল, এগারো টাকা কেন? বাকী টাকা না দিলে বর সভাস্থ করবার অনুমতি দেব না।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে হাত জোড় করে বল্লেন—আর যোগাড় করতে পারিনি—ওই নিয়ে আমায় মাপ করতে হচ্ছে বেহাই মশায়। আমার অবস্থার কথা আপনাকে আর কি বলব, ঘরের চালে দেবার জন্যে খড় কিনে রেখেছিলাম—সেই খড় বেচে ফেলে দিয়ে তবে ওই এগারো টাকা যোগাড় করেছি। সামনে বর্ষা আসছে, ঘরের মধ্যে এসে দেখুন চাল ফুটো—আলো আসছে। ঘর সারাবার আর কোন সঙ্কয় নেই। আর টাকা হলেও এই জষ্টি মাসে খড় পাব কোথায়?

এর পরে আমরা তর্ক চালাতাম, ছাড়তাম না। তোমার চালে খড় নেই তা আমাদের কিরে বাপু? মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছ, আগে থেকে তোড়জোড় করনি কেন? হইল তোমার বিয়ে-খাওয়া—আমরা বর সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

এসব কথা বলা চলতো, কিন্তু পাঁচুমামা দেখি ছট্‌ফট্ করছে—তার ইচ্ছে নয় টাকার জন্যে আমরা বিয়ে ভেঙ্গে দিই বা কোন বাধা সৃষ্টি করি। সে আমায় ডেকে কানে কানে বল্লে, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে! তার চোখমুখের করুণ ভাব দেখে আমি তো আর হেসে বাঁচিনে। সে কেবল ভাবছে, তার বিয়েটা বুঝি আমরা পাঁচজনে মিলে ভেস্তে দিলাম। যাই হোক, পাঁচুমামার অবস্থা দেখে আমরা আর বেশীদূর ব্যাপার গড়াতে দিলাম না; বর সভাস্থ করা হলো। মেয়েকে যখন আনা হলো, মেয়ের রূপ দেখে আমরা তো অবাক। এমন রূপসী মেয়ের সঙ্গে পাঁচুমামার বিয়ে হচ্ছে তা তো জানতাম না! কি গায়ের রং—কি সুন্দর গড়ন-পিটন, আর তেমনি মুখশ্রী। অমন রূপের ডালি মেয়ে কালেভদ্রে চোখে পড়ে। তাই পাঁচুমামা ক্ষেপে উঠেছে এই বিয়ের জন্যে—তাই এত জুয়োচুরি, এত আটঘাট বাঁধা, এত দুর্ভাবনা—পাছে এমন মেয়ে হাতছাড়া হয়ে যায়।

মনে মনে ভাবলাম—পাঁচুমামার অদৃষ্টটা দেখছি বেজায় ভালো। নইলে এমন মেয়ে ওর জোটে! ওর চাল নেই, চুলো নেই, তিন কুলে কেউ নেই—অজমূর্খ, গাঁজা খায়, নেশাভাঙ করে, কোন বদমাইশিটা ওর বাকী আছে জিগ্যেস করি। আমার দাদাকে আর আমাকে তো ও-ই নষ্ট করেছে! তার ওপর পাঁচুমামা ঘোর জুয়াচোর আর ঘোর মিথ্যাবাদী। লোককে ঠকাতে এমন ওস্তাদ আর দুটি নেই। এই বিয়েই তো করছে জুয়োচুরি করে। আমাদের বিষয়ে ওর পাঁচ আনা অংশ আছে না ছাই আছে। সত্যি কথা জানলে বিয়ে দিত মেয়ের বাপ? বিশেষ করে যখন এমন সুন্দরী মেয়ে!

যাক, সে সব কথায় দরকার কি আমাদের। বিয়ে-থাওয়া মিটে গেল, বর-কনে আমাদের বাড়ী এসে উঠল। বৌভাত কিন্তু আমাদের বাড়ীতে হবে না একথা ছিল আগে থেকেই। কারণ আমাদের এখানে বৌভাত করতে গেলে আমাদের নামডাকের উপযুক্ত জাঁকজমকের সঙ্গে বৌভাত করতে হয়—নইলে আমাদের নিন্দে হবে। সে খরচ দেয় কে, কাজেই ঠাকুরমা বলেছিলেন - বৌ এখানে তুলে তারপর তুমি পৈতৃক ভিটেতে নিয়ে যেও। সেখানে কাজকর্ম ক'রো গিয়ে। এখানে ওসব হবে না।

পাঁচুমামা বৌ নিয়ে নিজের বাড়ী চলে গেল।

আমার মা ছিলেন বড় খাঁটি লোক। তিনি জানতেন না যে পাঁচুমামা বিয়ের আগে কি জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েছিল, আমাদের বিষয়ে তার পাঁচ আনা অংশ থাকা নিয়ে।

মা বল্লেন—পাঁচুর বৌটি যেন হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা,—কিন্তু মেয়েটার অদৃষ্ট ভাল নয়। আমার জ্ঞাতি ভাই হলেও আমি বলছি—ওরকম পাত্রে অমন রূপের ডালি মেয়ে কি দেখে যে বুড়ো দিল, তা সেই জানে। ওই বাঁদরের গলায় ওই মুক্তোর মালা!

মা জানতেন না এর মধ্যে আসল কথাটা কি! পাত্রীর বাবার কোন দোষ ছিল না, যত সব জুয়োচোরের পাল্লায় পড়ে সরল বৃদ্ধ তাঁর সুন্দরী মেয়েটিকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছেন। সে জল যে কত গভীর জল, প্রথম থেকেই তা বুঝতে নববধূ বা তার বাপ, কারও বাকী রইল না। পাঁচুমামা বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়ী বন্দিপুরে চলে গেল বটে—কিন্তু বৌভাত হলো না সেখানে। পয়সা কোথায় পাঁচুমামার যে বৌভাত হবে?

বন্দিপুর বড় কখনো যেতাম না—এখান থেকে পাঁচুমামা চলে যাওয়ার পরে আমার সঙ্গে আর অনেক দিন ওদের দেখা হল না—বিয়ে করার পরে এখানে আসাটা যেন পাঁচুমামার কমে গেল। দাদা মাঝে মাঝে যেত বন্দিপুরে—এসে গল্প করত, পাঁচুমামার সংসার অতি কষ্টে চলছে। নতুন বৌয়ের গায়ে এক আধখানা গহনা যা তার বাবা দিয়েছিলেন, এরই মধ্যে পাঁচুমামা বেচে ফেলেছে। বৌটি কিন্তু খুব ভালো, সে ইচ্ছে করে গহনা খুলে দিয়েছে—ইত্যাদি।

বছর তিন-চার কাটল। তারপর একদিন খবর এল পাঁচুমামা মারা গিয়েছে। আগে থেকে নেশা-ভাঙ্ খায়, লিভার ছিল খারাপ, নেফ্রাইটিস্ হয়ে মারা পড়েছে, চিকিৎসাপত্র বিশেষ কিছু হয়নি।

দিন পনেরো পরে একদিন সকালে আমি বাইরের উঠানে একগাছা ছিপ চাঁচতে বসেছি—দাদা বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়েছে—ঠাকুরমা নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছেন—এমন সময় আমাদের বাড়ীর সামনে একখানা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল।

গাড়ী থেকে নামলেন হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে এবং তাঁর বিধবা মেয়ে।

আমি ছুটে কাছে এলুম—পাঁচুমামার বিধবা স্ত্রীকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম, বাঁড়ুয্যে মশায়কেও করলুম। রূপসী বটে এই বিধবা মেয়েটি। মেয়ে না অগ্নিশিখা! বিয়ের সময়েও তো এতটা রূপ দেখিনি মামীমার! আমি মামীমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে মার

কাছে রেখে হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের কাছে এসে বসলাম।

তিনি বল্লেন—যা হবার তো হয়ে গিয়েছে, তার আর চারা নেই। মেয়েটার এই সবে উনিশ বছর বয়েস—ওর মুখের দিকে তো চাইতে পারা যায় না। এখন এমন অবস্থা যে দিন চলে না, পাঁচু একটি পয়সা রেখে যায়নি যে মেয়েটা একদিন সেখানে হাঁড়ি চড়িয়ে খায়। ধার দেনা করে কোন রকমে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ সেরে শুদ্ধ করিয়েছি দাদা। ভাবলাম, আগে তো মেয়েটাকে শুদ্ধ করি, তারপর পাঁচুর বিষয়ের যে অংশ আছে এখানে, তা থেকে দেনা শোধের কথা ভাবা যাবে পরে। তাই আজ এলাম মেয়েটাকে নিয়ে। ওরও তো ঘোর দুরবস্থা। বন্দিপুরে একবেলা খায় এমন অবস্থা নেই। পরনে কাপড় ছিল না, দেনা করে একখানা সরুপাড় কাপড় কিনে দিয়েছিলাম শ্রাদ্ধের পরে, তাই পরে এসেছে। আমার তো অবস্থা সবই জানো—এখনও দুই মেয়ের বিয়ে দিতে বাকী, এক পাল কুপুষ্যি—তাদেরই খেতে দিতে পারিনে, তা আবার বিধবা মেয়ে নিয়ে গিয়ে রাখি বা কোথায়, খেতে বা দিই কি? এখন বিষয়ের পাঁচুর যা অংশ এখানে আছে—তা থেকে মেয়েটার একটা হিল্লে তো হোক। দেনাটা শেষ করে দিয়ে না হয় তার উপস্বত্ব থেকে এখানেই একখানা খড়ের ঘর তুলে দিই ওকে। ও তো মেয়েমানুষ, কিছু বোঝে না—আমি সঙ্গে করে আনলাম। মেয়েও বল্লে—বাবা, চলো সেখানে—তুমি দাঁড়িয়ে থেকে আমার একটা ব্যবস্থা করে রেখে এসো। আর তাঁরাও ভাল লোক—তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়ের অংশের যা আয় দাঁড়ায়—তা থেকে আমার একটা বিলিব্যবস্থা—আর বন্দিপুরে থেকেই বা কি হবে, সেখানে তো এক ভাঙ্গা খড়ের ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই—যখন বিষয় এখানে, সম্পত্তি এখানে, তখন এখানেই যা হয় একটা ঘরদোর বেঁধে—

আমি এই লম্বা বক্তৃতায় বাধা দিয়ে একটু আশ্চর্য্য হবার সুরে বল্লুম, কিসের বিষয়? কিসের অংশের কথা বলছেন?

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে বল্লেন—ওই যে পাঁচুর যে অংশ আছে এখানকার বিষয়ে, তা তো ধরো এখন আমার মেয়েরই অর্শেছে। তোমাদের এত বড় বিষয়ের পাঁচ আনা অংশ কি কম? ওর এক বেলা একমুঠো আলোচালের ভাত আর বছরে চারখানা কাপড় তা থেকে ছেলে খেলে চলে যাবে—

আমি বিনীত শান্ত হাসিমুখে ভদ্রতার সুরে বল্লাম—আপনি ভুল করেছেন বাঁড়ুয্যে মশায়, এখানকার বিষয়ে পাঁচুমামার কোন অংশ নেই।

—অ্যাঁ! সে কি কথা?

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে প্রথমটা তো হতভম্ব হয়ে গেলেন, পরক্ষণেই—কি ভেবে সামলে নিয়ে চিৎকারের সুরে বল্লেন—অংশ নেই কেমন কথা? বিয়ের আগে তো তোমরাই বলেছিলে পাঁচ আনা অংশ আছে—বলো নি? আর এখন বলছ নেই। আমার মেয়েকে ছেলেমানুষ পেয়ে এখন ফাঁকি দেওয়ার মতলব? বরাবর শুনে আসছি অংশ আছে, আর এখন অংশ নেই বল্লেই হলো?

আমারও রাগ চড়ে গেল মাথায়। আমি বল্লুম—আপনি মিছে চেঁচামেচি করেন কেন? আপনি বিষয় সম্পত্তির কিছুই বোঝেন না তাই ওকথা বলছেন। এ তো শোনাশুনির কথা নয়। দলিল দস্তাবেজের কথা, পড়চা কোবালার কথা। বিষয় সম্পত্তি গাছের ফল নয় যে—যে কুড়িয়ে পায় সেই খায়। আমার বাবা যদু চক্কত্তির নামে সাতখানা গাঁয়ের প্রজা কাঁপত—তিনি কি দুঃখে তেওটা বন্দিপুরের পাঁচু রায়ের বাবার কাছে বিষয়ের পাঁচ আনা বেচতে যাবেন? ও সব ভুলে যান। যা শুনেছেন, ভুল শুনেছেন। বিশ্বাস না হয় আমার কথা, রেজিস্ট্রী আপিসে দুটাকা ফি জমা দিয়ে খুঁজে দেখুন গিয়ে সেখানে এমন কোন দলিল আছে কিনা। আমরা দলিল গোপন করতে পারি, সেখানে তো গোপন থাকবে না?

চেঁচামেচি শুনে পাড়ার দু-পাঁচজন জড় হলো। তারাও হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের সরলতা দেখে কোনক্রমে হাসি চেপে রইল। যারা সেবার সাক্ষী দিতে এসেছিল যে পাঁচুমামার বিষয়ের অংশ আছে, তারাই বলে গেল পাঁচুর এখানকার বিষয়ের অংশ আছে এমন কথা কস্মিন্‌কালে তারা শোনেও নি।

সব শুনে হৃষীকেশের বিশ্বাস হলো শেষ পর্য্যন্ত যে এদের কথাই সত্যি।

তিনি তো মাথায় হাত দিয়া বসে পড়লেন—তারপরেই হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, ডুক্‌রে মেয়েমানুষের মত কেঁদে উঠলেন—আমি মেয়েটার সর্ব্বনাশ করেছি নিজের হাতে—তখন কি জানি এমন জুয়োচুরি আমার সঙ্গে সবাই করবে—আমার অমন সোনার পিরতিমে মেয়েটা—আমায় ভালমানুষ পেয়ে—

– ভাল হাঙ্গামাতেই পড়া গেল দেখছি সকালবেলা।

বুড়োর কান্না শুনে পাড়ার লোক জড় তো হলোই, বাড়ীর মধ্যে থেকে মা, ঠাকুরমা ছুটে এলেন, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রী পর্য্যন্ত সেই সঙ্গে ছুটে এলেন দেখতে যে তাঁর বাবাকে বুঝি আমি মারধর করেছি।

সে এক কাণ্ড আর কি!...

ঠাকুরমা তো বুড়োকে অনেক অনুরোধ করে তাঁর কান্না থামিয়ে তাঁকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। অনেক কি সব বোঝালেন-সোজালেন। আমায় ডেকে খুব বকুনি দিলেন; আমি নাকি লোকের সঙ্গে কথা কইতে জানি নে।

আমি বল্লাম—এর আর কথা কইতে জানাজানি কি, আমি যা সত্যি কথা তাই বলেছি। তুমিই বলো না কেন, আমাদের বিষয়ে পাঁচুমামার কি পাঁচ আনা অংশ ছিল?

মা শুনে অবাক, তিনি এসব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। বল্লেন—সে কি কথা! পাঁচুর এদের বিষয়ে অংশ কন থাকবে? এ কি রকম কথা, এ তো বুঝতে পারছি নে?

ক্রমে তিনি সব শুনলেন। আমার ও দাদার ওপর খুব রাগ করলেন শুনে। বল্লেন—বেশ, আমার ছেলেরা যখন এ জুয়োচুরির মধ্যে আছে, তখন আমি পাঁচুর বৌয়ের ভরণ-পোষণের ভার নিলুম। মেয়েকে এ বাড়ীতে রেখে চলে যান। আজ থেকে ও আমাদের ঘরের লোক।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে বল্লেন—জিগ্যেস করে দেখুন আপনার ছেলেকে? ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। বিয়ের আগে পাত্র আশীর্ব্বাদের দিন একথা বলেছিল কিনা! আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদের দেখে। আমি তো পাঁচুকে দেখে দিই নি। ভাবলাম আপনাদের আত্মীয়, আপনাদের বিষয়ের অংশীদার—তাই আমি সম্বন্ধ করি। তখন কি করে জানব এর মধ্যে এত জুয়োচুরি।

আমি বল্লাম—এ কথা আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বলছেন। যদি কেউ বলে মণীন্দ্র নন্দীর জমিদারীতে আমার অংশ আছে—অমনি তার অংশ হয়ে যাবে?

ঠাকুরমা আমায় আবার ধমক দিয়ে চুপ করালেন। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যেকে স্নান করতে পাঠালেন, তারপর খাইয়ে-দাইয়ে তাঁকে সুস্থ করলেন। যাবার সময়ে হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে ঠাকুরমায়ের হাতে ধরে বল্লেন—আমার মেয়েকে আপনি রেখে দিন। আমার সংসারে একপাল পুষ্যি, খেতে দিতে পারি নে। আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত, আমার মেয়েকে একবেলা একমুঠা আলোচালের ভাত—

মা ও ঠাকুরমা বল্লেন—তার আর কি, বৌমা থাকুন এইখানেই। পাঁচুর বৌ আমাদের তো আর পর নয়, কপালই না হয় পুড়েছে সকাল সকাল।

সেই থেকে পাঁচুমামার স্ত্রী আমাদের সংসারে রয়ে গেলেন। প্রথমে ছিলেন বেশ সুখেই, যতদিন মা ঠাকুরমা বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁরা একে একে গেলেন স্বর্গে। দাদার বিয়ে আগেই হয়েছিল, আমারও বিয়ে হলো। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যেও ওদিকে মারা গেলেন। পাঁচু-মামার স্ত্রীরও আর বাপের বাড়ী যাবার জায়গা রইল না।

নতুন বৌয়ের দল নিজের সুবিধামত সংসার সাজিয়ে নিয়েছিল। পাঁচুমামার স্ত্রীর এ-সংসারে থাকাটা তারা গোড়া থেকেই অনধিকার-প্রবেশ বলে ধরেছিল, এইবার সামান্য পান থেকে চুন খসলেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে অপমান করা শুরু করলে। এর আর একটা কারণ ছিল। পাঁচুমামার স্ত্রী ছিলেন অসামান্যা-রূপবতী বিধবা মানুষ, একবেলা খেতেন, একখানা নরুন পাড় কাপড় পরতেন—তাতেই তাঁর রূপ ধরতো না। বয়সের সঙ্গে সে রূপ ম্লান হওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন বাড়তেই লাগল।

নতুন বৌয়েরা দেখতে অমন সুন্দরী নয় কেউ-ই। তাদের মনে পাঁচুমামার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে নানা হিংসে, ঘোর সন্দেহ এসে জুটতে লাগল।

পাঁচুমামার স্ত্রী তো এ বাড়ীতে থাকতেন বিনি মাইনের রাঁধুনী ঝি চাকরাণীর মত। কিন্তু তাঁর ওপর অত্যাচার অবিচার তাতেও কম ছিল না।

আমার সত্যিই কষ্ট হতো পাঁচুমামার স্ত্রীর জন্যে। যে সহানুভূতি পাঁচুমামার ওপর কখনও হয় নি, পাঁচুমামার শ্বশুরের ওপর হয় নি—তা হয়েছিল এই অসহায় বিধবা নারীর ওপর।

কিন্তু আমার কথা কওয়ার কোন উপায় ছিল না। তা হলেই আমার স্ত্রী সন্দেহ করবেন, কেন আমি পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষে এত কথা বলছি। আমার পূর্ব্বেকার রেকর্ড খুব ভাল ছিল না, সুতরাং স্ত্রী পদে পদে আমায় সন্দেহ করতেন, আমিও যে না বুঝতাম এমন নয়। সুতরাং

পারিবারিক শান্তিভঙ্গের ভয়ে মুখ বুজেই থাকতাম।

এত সাবধান থেকেও একবার বড় বিপদে পড়ে গেলাম। সে দিনটা একাদশী। দেখি বেলা এগারটার সময়ে পাঁচুমামার স্ত্রী এক রাশ বাসন মেজে ডোবা থেকে উঠে আসছেন। আমি বড় বৌ অর্থাৎ আমার বৌদিদিকে বল্লাম,—বৌদিদি, মামীমাকে আজ বাসন মাজতে দিয়েছে কে? আজ একাদশীর দিনটা, তোমরা একটু দেখো শোন না সংসারের কাজের কি হয় না হয়?

বৌদিদি ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বল্লেন—ও সব লোক দেখানো ঢং! কে বললে বাসন মাজতে? অন্যদিন বল্লেও তো কাজ করতে দেখিনে—আর আজ বাসন না মেজে আনলে দরদ কুড়ানো যাবে কি করে? ওসব কি আর বুঝি নে? তা বুঝি।

বৌদিদি কি বোঝেন জানি নে, কিন্তু সেদিন রাত্রে আমার স্ত্রী আমায় বল্লে—ওগো, শোন একটা কথা বলি। কথা রাখবে বলো?

—কি কথা বলো?

—তুমি ওকে বাড়ীতে রাখতে পারবে না।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেম—কাকে গো? ভেঙেই বলো না?

—ওই যে তোমাদের মামীমাকে। ওকে এখুনি তাড়াও।

—কেন, মামীমা কি করেছেন?

—সোজা কথা বলি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে। ও তো তোমাদের আপন মামীমা নয়—বিশেষ কোন সম্পর্কও কিছু না। সামান্য পাতানো সম্পর্ক। আর ওই রূপ, আর ওই বয়েস। তোমাকে আমি চিনি—মিছে অশান্তি কেন সৃষ্টি করবে? সরাও ওকে এখান থেকে। আমি গতিক ভাল দেখছি নে।

বুঝলাম, সেই যে দুপুরবেলা পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষ হয়ে একটা কথা বলেছিলাম বড় বৌয়ের কাছে, তিনিই লাগিয়েছেন সমস্ত কথা ছোট বৌকে। কি বিশ্রী মন এই সব পাড়াগাঁয়ের মেয়েমানুষদের! অস্বীকার করি নে যে আমার রেকর্ড ভাল না, আমিই জানি আমি কি বা আমি কি নই। কিন্তু একজন আশ্রিতা অসহায়া তরুণী বিধবা, যাঁর প্রতি সত্যিই আমার সহানুভূতি ও অনুকম্পা, যাঁকে মামীমা বলে ডাকি—তাঁর সম্বন্ধে এই সব—

আমার মন একমুহূর্ত্তে বিরূপ হয়ে উঠলো সংসারের ওপর, স্ত্রীর ওপর, বৌদিদির ওপর, সমস্ত ব্যাপারটার ওপর, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রীর ওপর।

বল্লাম—বেশ ভালো, আজই যেতে বলছি।

মনে ভাবলাম, এমন করে বলবো যে স্ত্রী পর্য্যন্ত দুঃখিত ও অপ্রতিভ হয়ে উঠবে।

পরদিন সকালেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে ডেকে বললাম—আপনার আর এখানে থাকা হবে না। আপনাকে নিয়ে সংসারে অশান্তি বাধছে, আপনি এখুনি আমাদের বাড়ী থেকে অন্যত্র যান।

বড় বৌ বল্লেন—সে কি কথা! কাল গিয়েছে একাদশী, আজ দ্বাদশীর দিন। না খেয়ে

কোথায় যাবেন উনি। কাল সারা দিনরাত নিরম্বু উপোস গিয়েছে। সংসারের অকল্যেণ হবে যে!

মনে মনে ভাবলাম—সেইটেই বোঝ। আর একটা গরীব অসহায়া মেয়ের যে কি হবে তা মনেও ওঠে না। তোমাদের ভালো করেই কল্যাণ করাচ্ছি।

পাঁচুমামার বৌ কথাটি বল্লেন না। নিজের পুঁটলি গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে প্রস্তুত হলেন। আমি জানি তাঁর কোথাও যাবার জায়গা নেই—বাপের বাড়ী এক গাঁজাখোর বেকার ছোট ভাই আছে, সেখানে একমুঠো খাওয়াও জুটবে না এক বেলা। কিন্তু সব জেনেও বড় রূঢ় ও কঠিন হয়ে উঠলাম আজ। একাদশীর পরদিন না খেতে দিয়েই তাড়াবো। করাচ্ছি সংসারের কল্যাণ তোমাদের!

সেই সকালেই চা খেয়ে বসে আছি, পাঁচুমামার বৌ দুটি পান সেজে ডিসের বাটিতে আমার সামনে রেখে দিয়ে পুঁটলি বগলে করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি মুখে কিছু বলিনি, কেবল স্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে যাবার জন্তে আমাদের মুহুরী বৃদ্ধ গোপাল মিত্রকে পাঠিয়ে দিলাম এবং আপদ চুকে গেল ভেবে আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম। পাঁচুমামার বৌয়ের তারপর থেকে আর কোন খবর রাখি নি।

শান্তিরাম

সন্ধ্যার কিছু আগে একখানা ট্রেন ছাড়ে। রাত সাড়ে নটা আন্দাজ সেখানা ছেশের স্টেশনে পৌঁছায়। শান্তিরাম ওই ট্রেনেই বাড়ী যাওয়া ঠিক করিল।

কলে জল আসিয়াছে। ঝর্ ঝর্ শব্দে চৌবাচ্চায় পড়িতেছে। চৌবাচ্চাটা মাঝারি, ক্রমশঃ পুরিয়া আসিল বলিয়া। ভাদ্র মাসের পচা গুমোট, স্নান করিয়া লওয়া ভাল। কাপড় ভিজাইয়া দরকার নাই—গামছা পরিয়া শান্তিরাম অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিল। এখনও ঝাড়ুদার আসে নাই। এবেলা-ওবেলার উচ্ছিষ্ট ভাত, শাকের চিবানো ডাঁটা, মাছের কাঁটা ঝাঁঝরি ড্রেণের মুখে পড়িয়া জলের স্রোত আটকাইয়াছে, দেখিলে গা কেমন করে—কি নোংরা!…কিন্তু এই নোংরা, আঁস্তাকুড়ের মধ্যে আজ সাতটি মাস বাস করিয়াও পয়সা হইল কৈ? সে সব সহ্য করিতে পারিত যদি হোটেলটা হইতে কিছু পয়সা আসিত।

ভূপেনবাবু আপিস হইতে ফিরিয়া রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট ঘরের চাবি খুলিল। ঘরটার সামনে চালের বস্তা, ডালের বস্তা, বেগুন পটলের ধামা, শুকনা বিলাতি কুমড়া। আধ নাগরী আখের গুড়—একটা ছোট্ট আড়াইসেরা টিনের অর্দ্ধেক ভর্ত্তি সরিষার তৈল। বাজে হোটেলের মত যা তা তেল এখানে ব্যবহার করা হয় না, রামগোপাল মিলের মোহন-মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল। কিন্তু এতেও হোটেল চলিল না।

ভূপেনবাবু কলতলায় হাত পা ধুইতে আসিল। কাঁধে গামছা, পায়ে খড়ম। চটির দাম

বেশী। বেচারী পঁচিশটি টাকা মাহিনা পায়। ট্রাম কোম্পানীর আপিসে কাজ করে। ঘরের ভাড়া দেয় সাড়ে চার টাকা—পাইস্ হোটেল এটা, তবুও ভূপেনবাবুর সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত আছে—ঘরভাড়া বাদে এগারো টাকা।

ভূপেনবাবু বলিল—শান্তিরামবাবু, আপনি নাকি আজ চল্লেন?

—না গিয়ে কি করি বলুন। এতদিন তো বেয়ে ছেয়ে দেখলাম। কিছুই যখন হলো না, তখন থেকে লাভ কি, খাবই বা কি?

—কেন, আপনাকে এরা রাখবে না?

—আমার পোষাবে না। আমি ছিলাম হোটেলের মালিক, আর এখন ওদের তাঁবে আমাকে সাত টাকা মাইনে আর খোরাকীতে খাটতে হবে। আর ওই যে নিধিরামবাবু, ওঃ, এমন মানুষ যদি দুটি—বল্লাম আর পঁচিশটি টাকা বেশী দাও গিয়ে। দেনার দায়ে না হয় হোটেল বিক্রিই হচ্ছে, তা বলে আমায় ফাঁকি দিয়ে তোমাদের ভালো হবে। হোক, ভগবান মাথার উপর আছেন। তিনি দেখবেন। কারেই না হয় পড়েছি মশায়, চিরকাল এমন দিন থাকবে না, তাও বলে দিচ্ছি।

—বাড়ীতেই এখন থাকবেন?

—দেখি কি হয়! পয়সা যা পেলাম হোটেল বিক্রি করে, তা গেল পাওনাদারের দেনার পেছনে। মিথ্যে বলব কেন ভূপেনবাবু, আপনি আমার ছোটভাইয়ের মত, সাতটি টাকা আর রেলভাড়া—এই নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তাতে আর কদিন চলবে সেখানে?

হঠাৎ শান্তিরামের মনে পড়িয়া গেল—ধারে হোটেলের জন্য কড়া ও বালতি কিনিয়াছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটের গিরীন্দ্র কুণ্ডুর দোকান হইতে। হোটেল বিক্রি হইয়া যাইতেছে শুনিয়া তাহারা আজ কয়দিন জোর তাগাদা চালাইতেছে। খাইতে দেয় না, ঘুমাইতে দেয় না। তাহাদের বিল-সরকারকে আজ সন্ধ্যার সময় আসিতে বলা হইয়াছে। আসিলেই চার টাকা কয়েক আনা তাহাদের দেনা শোধ করিতে যাইবে। তবে বাড়ী যাইবে কি শুধু হাতে? পুঁজি তো সাতটি টাকা!

কাজের কথা নয়। তাহার আগেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। শেয়ালদ স্টেশনে গিয়া গাড়ীর জন্য বসিয়া থাকা ভাল। দেড় ঘণ্টা হোটেলে অপেক্ষা করিবার দণ্ড স্বরূপ চার টাকা কয়েক আনা দিতে সে রাজী নয়। নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া সে একখানা ময়লা কাপড় পাতিয়া দু-তিনখানা আধময়লা কাপড় ও জামা, কাঁসার গেলাসটা, পুরানো একজোড়া জুতা, একজোড়া খড়ম, পাটি একখানা—পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। না, এখানে কোন জিনিস ফেলিয়া গিয়া লাভ নাই। বাড়ীতে লইয়া গেলে গৃহস্থ সংসারে কত কাজে লাগিতে পারে।

ছোট্ট টিনের স্যুটকেসটার মধ্যে ধোপার বাড়ী হইতে সদ্য-আসা দুখানি ধুতি এবং একটা ছিটের কাপড়ের পাঞ্জাবি পুরিয়া নিজের গায়ের ময়লা শার্টটা পরিতেছে—রেলে যাইবার সময় ফর্সা জামা গায়ে দিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতেই যখন যাইতেছে সে, কুটুম্ব-বাড়ীতে নয়—এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—শান্তিরামবাবু আছেন?

—কে ?

—সেদিনকার সেই আধ টিন সর্ষে তেলের দামটা পাওনা—কাল আসতে বলেছিলেন, কাল দু-দুবার এসে দেখা পেলাম না।

—কত বাকি ?

—এক টাকা সাড়ে ন আনা।

শান্তিরামের একবার ইচ্ছা হইল বলে, কাল এসো সকালবেলা। কিন্তু ভূপেনবাবু পাশের ঘরেই রহিয়াছে, ভূপেনবাবু জানে, আজই হোটেল বিক্রী হইয়া গিয়াছে, সে—শান্তিরাম, আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে দেশে চলিয়া যাইতেছে, আর এখন ফিরিবে না। এ অবস্থায় পাওনাদারকে কি বলিয়া মিথ্যা কথা বলা যায় ?

অগত্যা দিতে হইল। সাত টাকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল এক টাকা সাড়ে ন আনা। এ বেড়া-আগুনের জাল হইতে বাহির হইতে পারিলে এখন সে বাঁচে। আবার কোন-দিক হইতে কে আসিয়া পড়িবে কে জানে ?

—চল্লেন তা হলে ?

—হেঁ হেঁ আসি। নমস্কার। কিছু মনে করবেন না।

—বাড়ী গিয়ে চিঠি দেবেন—কি রকম আছেন, কেমন তো ?

—হ্যাঁ, দেব বইকি—দেব না ?

বেশ লোক ভূপেনবাবু।

ডান হাতে টিনের বিবর্ণ স্যুটকেসটা, বাম বগলে পুঁটুলি ও ছাতা লইয়া শান্তিরাম হোটেল হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শেয়ালদ-এর মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল।

নাশপাতি—নাশপাতি—ছেলেদের জন্য কিছু কিনিয়া লওয়া যাক। দু'পয়সা জোড়া! ডাকাত নাকি রে বাবা! দু'পয়সা জোড়া নাশপাতি কে কবে শুনিয়াছে ?

দিব্যি আপেলগুলি। কত দর ? চার পয়সা জোড়া কেন, পয়সা পয়সা না ?

ফলওয়ালা চটিয়া বলিল—বাবু, কোন জমানা মে আপেল পয়সা পয়সা বিকা ?

অনেক দরদস্তুর করিয়া শান্তিরাম ছোট ছোট নাশপাতি দুই পয়সায় জোড়া দরে ছয়টি কিনিল, চার পয়সায় একজোড়া আপেলও কিনিল। পরিমল নস্য লইবে কিছু, দেশে ভাল নস্য পাওয়া যায় না।

ফলওয়ালাকে পয়সা বাহির করিয়া দিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল—এই যে শান্তিরামদা, এ কি, যাচ্ছ কোথায় ? বাড়ী নাকি ?

শান্তিরাম পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল তাহাদের দেশের (ঠিক গ্রামের নয়) সরোজ মুখুজ্জে। সরোজ এখানে কোন মেসে থাকে, সপ্তাহে সপ্তাহে দেশে যায়। চাকুরি করে মার্চেন্ট আপিসে। আশি-নব্বই টাকা মাহিনা পায়।

—আর ভাই, বাড়ী চল্লাম—সব উঠিয়ে দিয়ে চল্লাম।

—কেন, তোমার সেই হোটেল ?

—চালাতে পারলাম কই? চলতো ভাল, পাঁচ ভূতে খেয়ে আর বাকি ফেলে ফেল মারিয়ে দিলে। এক এক ব্যাটার কাছে আট টাকা দশ টাকা বাকি, খেয়ে যাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে! উপুড় হাত করবার নামটি নেই। তাগাদা করতে গেলেই আজ দেব কাল দেব। এদিকে আমার পাওনাদারেরা—বাড়ীওয়ালা, কয়লাওয়ালা, মুদি আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে। জোচ্চোরের জায়গা কলকাতা। এখানে কি ভদ্দরলোক আছে?

—কিন্তু শান্তিরামদা, দেশে কতদিন যাওনি বল তো? দেশের অবস্থা জানো? বাড়ী তো যাচ্ছ, বন্যেয় সব ডুবে গিয়েছে—রসময়পুর থেকে নৌকায় চড়বে আর একেবারে তোমাদের গাঁয়ের বটতলায় গিয়ে উঠবে, কলুবাড়ীর কাছে। চাল নেই, ধান নেই—সব ডুবেছে। জিনিসপত্রের দাম চড়া—লোকজনের ভয়ানক কষ্ট। কত বাড়ী ঘর পড়ে গিয়েছে—আর এই দুর্দ্দিনে তুমি যাচ্ছ দেশে? এখন যেও না আমি বলি!

—না গিয়ে কি করি?

—এখানে থেকে পয়সা উপায়ের চেষ্টা কর। এখানে নানা পথ আছে—দেশে কিছু নেই—এক ভিক্ষে ছাড়া। তাই বা দেবে কে? এখানে থেকে বাড়ীতে পয়সা পাঠাও, তাদের উপকার হবে। শুধু হাতে বাড়ী গিয়ে কি করবে? আচ্ছা আসি শান্তিরামদা, আসি।

বন্যার খবর শান্তিরাম কিছু জানে না। বাড়ীর চিঠি পায় নাই আজ পনেরো-কুড়ি দিন। চিঠি না পাওয়ার কারণ সে জানে। তিন পয়সা দাম একখানা পোস্টকার্ডের, পাড়াগাঁয়ের লোক নিতান্ত দরকারী খবর দিবার না থাকিলে চিঠি বড় একটা দেয় না। বিশেষতঃ তাহার সংসারের যা অবস্থা। তিনটি পয়সা তিনটি মোহর।

ট্রেন ছাড়িল। বেলা একদম পড়িয়া আসিয়াছে। স্টেশনের সিগন্যালের লাল সবুজ আলো জ্বালতেছে। গাড়ীতে লোক বেশী নাই। শান্তিরাম এককোণে বসিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া মাঝে মাঝে বিড়ি টানিতে টানিতে ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

সরোজ যাহা বলিল, তাহাতে বাড়ী যাইবার উৎসাহ তাহার কমিয়া গিয়াছে। সত্য বটে সে ন-দশ মাস বাড়ী যায় নাই। সে অগ্রহায়ণ মাসে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, স্ত্রীর শেষ সম্বল বালা দুগাছা বিক্রয় করিয়া দুইশত টাকা লইয়া ব্যবসা করিতে আসিয়াছিল কলিকাতায়।

দুইশত টাকার মধ্যে বাড়ী লইয়া ফিরিতেছে পাঁচ টাকা সাড়ে ছ-আনা। অবশ্য এ কয় মাস কিছু কিছু খরচ পাঠাইয়াছিল বাড়ীতে—কিন্তু গত আষাঢ় মাসের শেষ হইতে আর কিছুই দিতে পারে নাই।

দেশে থাকিতে পয়সা উপার্জ্জনের কোন পথ সে বাকি রাখে নাই। লেখাপড়া তেমন জানে না বলিয়া চাকুরি জোটে নাই, না-ই বা জুটিল চাকুরি? ব্যবসা করিয়া বড়লোক হওয়া যায়, চাকুরিতে নয়। গুড়ের ব্যবসা, কাঠ চালানির ব্যবসা, তরকারি চালানির ব্যবসা, এমন কি মাছ চালানি পর্য্যন্ত। কিছুতেই কিছু হইল না। তাই স্ত্রীর বালাজোড়া লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল কোন একটা ব্যবসা করিতে।

অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল হোটেল খুলিতে। খারাপ কিছু চলে নাই, দুবেলা লোকজন খাইতেছিলও মন্দ নয়।—কিসে কি হইল ভগবান জানেন, খরচে আয়ে আর কিছুতেই কুলায় না এমন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। বাড়ীভাড়া বাকি পড়িয়া গেল তিন মাসের। বাড়ীওয়ালা শাসাইল জিনিসপত্র আটকাইয়া ভাড়া আদায় করিবে। মুদির দেনা, কয়লাওয়ালার দেনা, তরকারীওয়ালার দেনা, মাছওয়ালার দেনা, দুধওয়ালার দেনা, ঠাকুরের মাহিনা বাকি, ঝি চাকরের মাহিনা বাকি—হোটেল চলে কি করিয়া?

সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল—সত্যসত্যই সর্ব্বস্বান্ত। এতটুকু সোনার গুঁড়া নাই ঘরে, এই কটি টাকা মাত্র সম্বল। বাড়ীতে পা দিলেই চৌকীদারি ট্যাক্সের তাগাদা—সেখানেও মুদির দেনা, গোয়ালার দেনা কোন-বা দশ পনেরো টাকা না জমিয়া গিয়াছে!

তাহার উপর দেশের অবস্থা যে-রকম শোনা গেল, সব কিছু ডুবিয়া গিয়াছে, জিনিসপত্রের দাম চড়া, ধার মেলা দুষ্কর হইয়া উঠিবে এ বাজারে। স্ত্রীপুত্র হয়তো বা উপবাসে দিন কাটাইতেছে। নীরদা কত আশা করিয়া আছে, পূজার সময় (আর দিন সতেরো বাকী পূজার) স্বামী কলিকাতা হইতে সকলের জন্য নতুন কাপড় এবং টাকাকড়ি লইয়া বাড়ী ফিরিবে!

নীরদাকে একদিনের জন্যও খুশী করিতে পারে নাই সে। বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত অভাব অভাব—অভাব আর ঘুচিল না কোনদিন। অদৃষ্ট! তাহার অদৃষ্ট না নীরদার অদৃষ্ট? দুজনেরই।

দেশের স্টেশনে নামিয়া সহযাত্রীদের মুখে শুনিল, পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে পৌছানো যাইবে না। মাতুগঞ্জের বড় বিল ভাসিয়া রাস্তার উপর এক কোমর জল—এত রাত্রে নৌকাই বা পাওয়া যায় কোথায়? চিলমারির নবীন কলু তাহার মুদীর দোকানের জন্য কলিকাতায় মাল কিনিতে গিয়াছিল। সে তিন গ্রোস দেশলাই ও দুই তিনটি মিছরীর কুঁদো লইয়া বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

—এই যে দাদাঠাকুর! কলকেতা থেকে এলেন বুঝি? এই গাড়ীতেই এলেন—কই দেখিনি তো! এখন কি করে যাই বলুন তো। একটা লোক নেই ইষ্টিশনে। নৌকো থাকবার কথা বলা ছিল, কই কাউকে তো দেখছি নে। আপনিও তো যাবেন, ওদিকে সব জলে জলময়।

একজন কুলি তাহাদের জিনিসপত্র ঝাঁকায় করিয়া লইয়া যাইতে রাজী হইল। কুলিটার মুখে শোনা গেল, স্টেশন ছাড়াইয়া যে বড় মাঠ, কিছুদূর গেলে সেই মাঠের ধারে জেলেদের নৌকা ভাড়ার জন্য মজুত আছে। মাঠ জলে ভাসিয়া সমুদ্রের মত দেখাইতেছে—শুধু বাবলা গাছ ও অন্যান্য গাছপালার খানিকটা করিয়া জায়গা আছে মাত্র।

শান্তিরাম অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বলিল—হ্যাঁ নবীন, এ রকম বন্যে তো আমাদের জ্ঞানে কখনো দেখিনি। এ কি হয়েছে, এ যে চেনা যায় না কিছু! গাঁয়ের মধ্যে জল ঢুকেছে নাকি?

বাড়ী পৌঁছিতে রাত এগারোটা বাজিয়া গেল। সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শান্তিরাম ছোট ছেলের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে নীরদা উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দোর খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিল। রং ফর্সা, রোগা চেহারা, শান্তিরামের অপেক্ষা সাত বছরের ছোট সুতরাং বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হইয়াছে। মাথার চুল সামনের দিকে অনেক উঠিয়া গিয়াছে। মুখের লালিত্য অনেক দিন নষ্ট হইয়াছে। পরনে লাল পাড় ময়লা শাড়ী; চুলবাঁধা বা পরনপরিচ্ছদের মধ্যে এতটুকু পারিপাট্য নাই। অতিরিক্ত পান দোক্তা খাইয়া দাঁতগুলি কালো।

—এত রাত্তিরে কোন গাড়ীতে এলে! ভাও ওগুলো আমার হাতে। বাবা, একখানা চিঠি না পত্তর না—ভেবে মরছি। সতুর আজ আবার তিন দিন জ্বর আর পেটের অসুখ—বুলুর একটা ফোড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, ভাবছি আজকালের মধ্যে একখানা পত্তর দেব। তার ওপরে চারিদিকে জল! হাটবাজার করে এনে দেবার লোক পাচ্ছিনে, এই জল পেরিয়ে কে আমার জন্যে চিলেমারি থেকে জিনিস কিনে এনে দেবে! এলে বাঁচলাম—কি আতান্তরে যে পড়েছি—তার ওপর এদিকে হাতে—ও বুলু, কি বলছে শোন, এই যে যাই—চেঁচিও না, কে এসেচে ভাখ্—

—তোমার শরীর ভাল আছে? এই এতে আপেল আর নাশপাতি আছে, সতুকে বুলুকে দাও। খুকীকে দাও এই লেবেঞ্চুস—কলার আর কমলালেবুর। খুকী ভাল আছে তো? চল ঘরে—

—দাঁড়াও একটু, আলোটা জ্বালি, ঘরে অন্ধকার। সামনেই সব শুয়ে আছে, মাড়িয়ে চটকে দেবে।

খানিক পরে শান্তিরাম সুস্থ হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে। ছেলেমেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া কেহ আপেলের টুকরা কেহ লেবেঞ্চুস খাইতেছে। নীরদা স্বামীর জন্য ভাত চড়াইতে গিয়াছে রান্নাঘরে।

নীরদা নিশ্চয়ই ভাবিয়াছে, সে না জানি কত টাকা লইয়াই ঘরে আসিয়াছে! নীরদাকে কিছু বলা হইবে না এখন। না, বলাই ভালো। মিথ্যা আশায় রাখিয়া লাভ কি! নীরদার মুখে আনন্দ ও উৎসাহ যেন ধরিতেছে না। কষ্ট হয় বলিতে—নীরদা, যা ভাবছো তা নয়, আমার হোটেল বিক্রী করে দিয়ে চলে এলুম। সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েছে, তোমার সে বালা গিয়েছে, তার টাকা গিয়েছে। পাঁচ টাকা সাড়ে ছ আনা মাত্র হাতে অবশিষ্ট আছে।

এ কথা বলিতে কষ্ট হয়। নীরদাকে কোন সুখটা দিয়াছে জীবনে সে?

নীরদা ভাত চড়াইয়া দিয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিল। বলিল—পুজোর আগে আবার যাবে বুঝি! তা এই যাবে আবার আসবে, মিছিমিছি পয়সা খরচ। একেবারে আর দুদিন দেরি করে পুজো পর্য্যন্ত থেকে যাও। ওদের কাপড়-চোপড় এনেছ নাকি?

শান্তিরাম একবার ভাবিল বলে—নীরদা, কিছু নেই, সব গিয়েছে। তোমার বালা জোড়াটাও। সব উঠিয়ে দিয়ে এলাম। হাত একেবারে খালি! পুজোর কাপড়-চোপড় তো

দূরের কথা, তোমাদের খেতে দেবো যে কোত্থেকে তাই ভেবে—

তবুও আজ আট মাস পরে বাড়ী আসিয়া তাহার কি ভালই লাগিতেছিল। কলিকাতায় হোটেল খুলিয়া থাকা—সে এক অন্য ধরনের জীবন। এই কয় মাসে সে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। কখনো যে ঘরছাড়া হয় নাই তাহার পক্ষে একা ওভাবে নির্বান্ধব স্থানে থাকা কি ভাল লাগে? এ তাহার নিজের বাড়ী—সকলে এখানে আপন। এখানে নীরদা আছে, সতু, বুলু, খুকী, পিসিমা। পাশের বাড়ীতে দুর্গাদাস কামার, নিতাই কামার,—এরা সব তাহার আপন। নিতাই তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, লেখাপড়া শেখে নাই—পৈতৃক বৃত্তি দা-বাঁধানো, লাঙলের ফাল-পোড়ানো অবলম্বন করিয়াছে। তাহাকে সে যে কত দিন দেখে নাই! নিতাই কামারের দোকানঘরের জামকলতলার ছায়ায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে নিতাই এবং কামারদোকানের সমাগত লোকজনের সঙ্গে বেগুন কুমড়ার গল্প করিতে কি সুখ! তার তুলনায় হোটেল? কাল নিতাইয়ের সঙ্গে সকালেই দেখা করিতে হইবে।

শান্তিরাম খাইতে বসিল।

—হ্যাঁ গা, পুজো পর্য্যন্ত থাকবে তো?

—হ্যাঁ।

—তা কাপড়জামা ওদের কলকাতা থেকে আনলে না কেন? এখানে দর বেশী।

—দর? হ্যাঁ, তা বেশী।

—হোটেল দেখাশোনা করবে কে এখন?

শান্তিরাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হোটেল নেই।

নীরদা বিস্ময়ের সুরে বলিল—নেই! তবে অন্য কি—কেন, এই সেদিনও তো চিঠি লিখলে হোটেলের কাজ চলছে ভাল।

শান্তিরাম বলিল—চলছিল তো ভালই। তারপর কিসে থেকে কি হলো, কেবল দেনা বাধতে লাগলো। বিক্রি হয়ে গেল দেনার দায়ে।

—সে বালা-জোড়াটা আছে তো! এনেছ সঙ্গে তো?

নীরদা এই ধরনের প্রশ্ন করিয়া বড় বিপদে ফেলে। এই ধরনের প্রশ্ন না করিয়া যদি বলিত—"সে বালা দুগাছাও ঘুচিয়ে দিয়েছ তো?" তাহা হইলে উত্তর দেওয়াটা সহজ হইত যে বালা ঘুচিয়া গিয়াছে। মিটিয়া গেল। এতখানি আশা-ভরা প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে এমন—

না, সংসার করা এত বিপদ জানিলে সে বিবাহ করিত না। বিবাহ সে ইচ্ছা করিয়া করেও নাই। স্বর্গীয় পিতৃদেব বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রবধূর মুখ দেখিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় উনিশ বছরের ছেলে শান্তিরামের বিবাহ দিয়া যান বারো বছর বয়সের নীরদার সঙ্গে।

—ইয়ে, বালা কোথায় নীরদা? বালা বিক্রী করেই তো হোটেল খুলেছিলাম।

নীরদা হঠাৎ নিজের গালে চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—ওমা আমার কি হবে, ওমা আমার কি হবে—

শান্তিরাম বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ, কি ছেলেমানুষি কর—থামো—

ছেলেমেয়েরা কাঁদিয়া উঠিল।

শান্তিরামের ভাত খাওয়া হইল না—সে ভাত ফেলিয়া উঠিয়া নীরদার হাত ধরিল। স্বামীস্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। নীরদাকে শান্ত করিতে শান্তিরামের সময় লাগিল। মেয়েমানুষকে বোঝান দায়। অনেকক্ষণ পরে নীরদা কিছু প্রকৃতিস্থ হইল। চোখে মুখে জল দিয়া আসিয়া বলিল—তোমার খাওয়া হলো না—আর দুটি ভাত আছে, বেড়ে নিয়ে আসি—

—না না, থাক। শোয়া যাক এখন। রাত হয়েছে বারোটা কি একটা—

শান্তিরাম স্ত্রীর প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইয়াছে—একজোড়া বালা না হয় গিয়াছে, তা বলিয়া, সে খাইতে বসিয়াছে আর এমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! ছিঃ, এর নাম সংসার? একটু সান্ত্বনার কথা নাই, সহানুভূতি নাই! আচ্ছা, সন্ন্যাসী হইয়া গেলে কেমন হয়? অনেকে তো যায়। সংসার আর ভাল লাগে না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঠিকই বলিয়াছেন—কামিনী কাঞ্চন অসার। তাহাদেরই গ্রামের পাশে বন্দিপুরের মুখুজ্জে বাড়ীর বড় ছেলে রাধাকান্ত বহুদিন আগে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিল—এখন কি একটা বেশ বড় গোছের নাম লইয়া কাশীতে মঠ করিয়া আছে। বহু শিষ্য সেবক। দুধ ঘি খায়, কোন কষ্ট নাই—পায়ের উপর মোহর প্রণামী। দিব্যি আছে। আর সংসার করিলে তাহারও দশা এই রকমই হইত—ছেলেপিলে লইয়া জড়াইয়া মরিতে হইত এতদিন।

কামিনী কাঞ্চন সত্যই অসার!

নীরদাও স্বামীর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল না। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, বালা-জোড়াটা একমাত্র সম্বল ছিল। এই তো সংসারের ছিরি! তাহার বাবার দেওয়া বালা। শ্বশুরবাড়ী?…তাহা হইলে ভাবনা থাকিত না! এক কুচো এখানকার সোনা কোনদিন অঙ্গে ওঠে নাই। কি বিবাহই দিয়াছিলেন বাবা! অকর্ম্মণ্য—আসল কথা এই যে অকর্ম্মণ্য স্বামী। কত পুরুষ মানুষ কত কাজ করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছে, গরীব অবস্থা হইতে বড় লোক হইতেছে। আর তাহার স্বামী যাহা ঘরে আছে বা ছিল, তাহাও ঘুচাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী আসিয়া বসিল। বড়লোক হইতে সে চায় না! কিন্তু এই দুর্ব্বৎসরের বাজারে ছেলেপিলের মুখে অন্ন দিতে হইবে তো? এমন লোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই। বিবাহের শখ আছে, স্ত্রীপুত্র পুষিবার ক্ষমতা নাই।

শেষরাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি আসিল, ফুটা ছাদ দিয়া নানাস্থানে জল পড়িতে লাগিল। নীরদা ছেলেমেয়েদের লইয়া সরিয়া বিছানা পাতিল স্বামীর মশারি ভিজিতেছিল দেখিয়া তাহাকে উঠাইল। শান্তিরাম কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে উঠিয়া বিছানার উপর বসিয়া বলিল—আঃ, কি?

—মশারি ভিজছে—ওঠো একটু। বৃষ্টি এসেছে বড্ড।

নীরদা মশারি খুলিয়া কোণের দিকে লইয়া গিয়া আবার খাটাইতে লাগিল। শান্তিরাম বিরক্তমুখে বিছানায় বসিয়া ছিল, কেরোসিনের টেমির মৃদু আলোয় নীরদার দিকে চাহিয়া দেখিল—নীরদা দেখিতে যেন বুড়ী হইয়া গিয়াছে এরই মধ্যে। বিবাহের পর প্রথম কয়েক বছর কি সুন্দর ছিল দেখিতে। সে রং, সে চেহারা কয়েক বছরের মধ্যেই যেন ভোজবাজির মত উড়িয়া গেল।

ঠিক তেমন ভালবাসাই কি এখন আছে? সে আকুলি-বিকুলি ভাব, না দেখিলে বাঁচি না ইত্যাদি - বহুদিন চলিয়া গিয়াছে।

নীরদা মশারি খাটাইতেছে। সামনের কপালখানা মাঠের মত চওড়া হইয়া গিয়াছে চুল ওঠার দরুন, ময়লা শাড়ীখানাতে চেহারা আরও খারাপ দেখাইতেছে। যেন ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েই নয়। ফর্সা একখানা কাপড় পরিলে কি হইত?

শান্তিরামের মনে স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ কেমন অনুকম্পা জাগিল। বেচারী নীরদা!

তাহারই দোষে নীরদা অমন হইয়া গিয়াছে। মেয়েমানুষ অসহায়, যেমন রাখিবে তেমনি থাকিবে। পরাও না শান্তিপুর ফরাসডাঙার জরিপার শাড়ী, চড়াও না মোটরগাড়ীতে? এমন চড়িবে যখন, সাজসজ্জাও করিবে তখন। উহার দোষ কি?

না—কাল উঠিয়া কোন একটা চেষ্টা-চরিত্র দেখিতে হইবে। হাত-পা হাড়াইলে চলিবে না!

নীরদা বলিল—পান দেব, পান খাবে?

—না। এক গেলাস জল বরং দাও! তামাকের পাত্রটা কোথায় রেখেছ? টিকে-গুলোতে জল না পড়ে।

—তামাক খাবে নাকি? সাজবো?

—থাক, তুমি জল দাও। তামাক আমি সাজছি।

তামাক টানিতে টানিতে শান্তিরাম বলিল—এখানে আর দেনা কত হয়েছে?

—তা পনেরো-ষোল টাকা কেষ্টর দোকানে বাকি পড়েছে। রোজ তাগাদা করে, বলেছিলাম পূজোর সময় বাড়ী এলে একেবারে নিও—

—পনেরো-ষোল টাকা! এত ধার জমলো কি করে?

নীরদা একটু ঝাঁজের সহিত বলিল—জমবে আর কি করে। চার মাস যে বাড়ীতে উপুড়-হাত করোনি সে কথা মনে আছে? চালাচ্ছি কি করে তবে? তবুও আমার কথায় চাল ধার দেয়—নইলে পাড়ায় ধার দেওয়া দোকান থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

এই কথাটিতে শান্তিরামের দুর্ভাবনা আবার বাড়িয়া গেল। একটা টাকা যাহার কাছে একটা মোহর—বর্ত্তমানে, তাহার মুদীর দোকানে পনেরো-ষোল টাকা বাকি! না শোধ করিলে অবশ্যই চলে এবং চলিতও। কিন্তু বর্ত্তমানের অসহায় অবস্থায় দোকান হইতে ধারে জিনিসপত্র না লইলে চলিবে না এবং লইতে গেলেই পূর্ব্বের দেনার কিছু অংশ শোধ করিতেই হইবে।

নীরদা বলিল—শুয়ে পড় এখন। ভেবে আর কি হবে। যা হবার হবে।

নীরদার এ কথাটা আবার শান্তিরামের বেশ লাগিল। নীরদার মনে ভালবাসা আছে। দুঃখ হোক, কষ্ট হোক, নীরদার মুখখানা দেখিলে তবুও যেন অনেকটা শান্তি।

নীরদা বলিল—ওগো শোন, তোমাদের গাঁয়ে পশুপতি মুখুজ্জে কে ছিল? পুকুরধারের ওই যে বড় দোতলা বাড়ীটা? ও তো আমার বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত পড়েই আছে ওই ভাবে। ওই বাড়ীর লোক এসেছে, আজ পুকুরের ঘাটে গিয়ে দেখি গাড়ী করে নামলো। একজন ছোকরা, এক ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে, এক বুড়ী বোধ হয় ওদের মা—মেয়েটা আইবুড়ো, বেশ দেখতে। ওরা পশ্চিমে থাকতো না?

শান্তিরাম বলিল—পশুপতিদাদার বাড়ীতে? তা হবে। পশুপতিদাদা তো মারা গিয়েছেন আজ সাত-আট বছর। তাঁর ছেলে শুনেছি ইঞ্জিনিয়ার। এতকাল পরে দেশের কথা মনে পড়েছে বোধ হয়। লখনৌ না কানপুর কোথায় থাকে।

—কোন জন্মে তো আসতে দেখিনি। বাড়ীটা তো ভাঙাচোরা, থাকবে কি করে ও বাড়ীতে?

পরদিন সকালে শান্তিরাম বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি সুদর্শন যুবক আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—কাকা চিনতে পারেন?

শান্তিরাম বুঝিল এটি পশুপতি মুখুজ্জের ছেলে, যাহার কথা রাত্রে হইয়াছিল। বলিল—এসো বাবা, এসো। তোমার খুড়ীমা বলছিলেন তোমরা কাল এসেছ। তোমার বাবার সঙ্গে আমার যথেষ্টই—আহা পুণ্যাত্মা লোক—তোমাদের রেখে স্বর্গে চলে গিয়েছেন- বসো বাবা, বসো। বৌদিও এসেছেন নাকি?

না, মায়ের শরীর ভাল না। সঙ্গে এসেছেন আমার এক সম্পর্কে মাসীমা। আমি কখনো গাঁয়ে আসিনি—কাউকে চিনি নে। সকলের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াচ্ছি। দেখুন, এই বাপঠাকুরদার দেশ। অথচ কাউকে চিনি নে। বাড়ীটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে একেবারে। কাল সারা রাত্তির বিছানায় জল পড়েছে। সঙ্গে আমার বোন আছে—ওকেও নিয়ে এলাম, এবার ম্যাট্রিক দেবে। কলকাতায় মামার বাড়ী থেকে পড়ে।

—বেশ বেশ, খুব ভালো বাবা। যাবে আসবে বৈ কি! তোমরা গাঁয়ের রত্ন, না এলে-গেলে কি হয়? দেখছ তো গাঁয়ের অবস্থা। এমন সোনার চাঁদ ছেলে সব থাকতে, আমরা কি কষ্টটা পাচ্ছি দেখ গাঁয়ে থেকে। তোমার নামটি কি বাবা?

যুবক বলিল—আজ্ঞে আমার নাম সুশান্ত। আমার বোনের নাম চিন্ময়ী, চিনু বলে ডাকে। আপনার কাছে যে জন্যে এলাম তা বলি। বাবা আমাদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, ঠাকুরদাদার নামে গাঁয়ে একটা পুকুর কেটে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। আজ সাত বছর বাবা মারা গিয়াছেন, কিন্তু নানা কারণে আমার গাঁয়ে আসা ঘটেনি। তাই এবার ভাবলুম—যাবই। কাজটা সেরে আসি। আমাদের বাড়ীর সামনে যে পুকুরটা রয়েছে, ও তো একেবারে মজা। ভাবছি ওটাকে কাটাবো। পাড়ার লোকের জল খাওয়ার সুবিধে হয়

তা হ'লে। তা ও-পুকুরে আপনার অংশ আছে শুনলাম। আমি অন্য সব অংশীদারের কাছে গিয়েছিলাম, তাঁরা সব রাজী হয়েছেন। এখন আপনি যদি—আমি অবিশ্যি ন্যায্য দাম যা হয় দেব। সকলকেই দেব।

শান্তিরাম বলিল—এঃ আর কি বাবা, খুব ভাল কথা। তোমার খুড়ীমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে ওবেলা কি কাল যা হয় বলব।

যুবক চলিয়া গেল। শান্তিরাম স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—শোন, শোন। একেবারে অকূল ভাবছিলাম, একটা কূল দেখা দিয়েছে—

তারপর পুকুরের ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া বলিল—মজা এঁদো পুকুর পড়ে আছে শেওলা হয়ে। কখনো কিছু তো হয় না। যা পাও, পঁচিশটে টাকাও দেবে। ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন। ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে পাঁচ পয়সার হরিলুট দিও।

দুপুরের পর পশুপতি মুখুজ্জের মেয়েটি শান্তিরামের বাড়ী বেড়াইতে আসিল। নীরদাকে প্রণাম করিয়া বলিল, কাকীমা, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

নীরদা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেয়েটির চিবুক ছুঁইয়া আদর করিয়া বলিল, এসো মা আমার, এসো, বসো। গরীব কাকার বাড়ী, তোমায় মা কোথায় বসাই; এ আসনখানাতে বসো মা।

দুজনে ভাবসাব খুব শীঘ্রই হইয়া গেল। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। সারা দেহে একটা গতির হিল্লোল, ছিপছিপে গড়ন, মাথায় একরাশ চুল, একটু নামাইয়া এলানো খোঁপা-বাঁধা—সাদা-সিধা ধরণের শাড়ী ব্লাউজ পরনে। হাসি ছাড়া যেন কথা কহিতে পারে না মেয়েটি।

নীরদা বলিল—তোমার দাদা এসেছিল ওবেলা তোমার কাকার সঙ্গে দেখা করতে। শুনলাম বড় ভাল ছেলেটি। তুমি ইস্কুলে পড় শুনলাম। কি পড়?

—ক্লাস টেন্-এ পড়ি। এবার ম্যাট্রিক দেব।

—তোমার মা এলেন না কেন? কখন দেখিনি তাঁকে।

—তাঁর শরীর ভাল না। বিছানা থেকে উঠলে মাথা ঘোরে—কোথাও বেরুতে পারেন না।

—আহা! তাঁর দেখাশুনো কে করে? তোমার দাদার বিয়ে হয়েছে?

—না, দাদা বিয়ে করবে না এখন। দেশসেবা করবে, যারা লেখাপড়া জানে না তাদের লেখাপড়া শেখাবে—এসব দিকে মন। দেশের কাজ করবে বলে পাগল। অন্য ধরনের মানুষ দাদা।

দাদার কথা বলিবার সময় মেয়েটির চোখের দৃষ্টি স্নেহ ও শ্রদ্ধায় নম্র হইয়া উঠিল। ক্ষণে ক্ষণে ইহার মুখের চেহারা যেন বদলাইয়া যাইতেছে। ভারী জীবন্ত চোখমুখ—এসব পাড়াগাঁয়ে নীরদা কখনও এমন মেয়ে দেখে নাই।

অনেকক্ষণ বসিয়া এগল্প ওগল্প করিবার পর মেয়েটি উঠিতে চাহিলে নীরদা বলিল—চিনু মা, গরীব কাকীমার বাড়ী এসেছ যদি, কিছু না খেয়ে তো যেতে পারবে না। তুমি বসো,

আমি একটু হালুয়া করে আনি—

চিনু বলিল—মুড়ি নেই কাকীমা? মুড়ি খেতে বড় ভালবাসি।

নীরদা তাড়াতাড়ি মুড়ি মাখিয়া আনিয়া দিয়া বলিল—তুমি কি মুড়ি খেতে পারবে মা, সেই জন্যে দিতে ভরসা করিনি। আমি নিজে মুড়ি ভাজ—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল মুড়ির ধান ফুরাইয়াছে, অথচ কিনিবার পয়সা নাই। আর দুদিন পরে চিনু আসিলে তাহাকে মুড়ি দিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত থাকিত না। মানসম্ভ্রম কি করিয়া বজায় থাকে যে সংসারে পুরুষ মানুষ অমন অকর্ম্মণ্য!

চিনু সেদিন গেল, কিন্তু পরদিন সকালে আবার আসিয়া প্রায় ঘণ্টা-দুই নীরদার সঙ্গে কাটাইয়া গেল। ভারি অমায়িক মেয়ে, এদিন সংসারের যত তরকারি, সব বঁটি পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কুটিয়া দিতে লাগিল, নীরদার কোন বারণ শুনিল না। পাড়ার অন্য সকলের বাড়ীতে চিনু তত যায় না, যত এখানে সে আসে। নীরদাকে তাহার কি যে ভাল লাগিল সে-ই জানে। দিনে অন্ততঃ দুইবার তার এখানে আসাই চাই। নীরদারও তাহাকে বেশ ভাল লাগে।

দিন দশ বারো পরে একদিন শান্তিরাম স্ত্রীকে বলিল—শুনেছ, আমার অংশের দাম ধার্য্য হয়েছে বত্রিশ টাকা। আশা করি নি এত হবে! তা সবাই যে দর নিয়েছে আমিও তাই নিলাম।

নীরদা অবাক হইয়া বলিল—সে কি গো! এই এক মজা ডোবা, বত্রিশ টাকা করে অংশ হলে'ছ-অংশের জন্য সুশান্তকে দুশো টাকা দিতে হবে?

—তা হবে বৈ কি। ঠাকুরদাদার নামে পুকুর প্রতিষ্ঠে করবার গরজ আছে—টাকা খরচ করবে না?

নীরদা গম্ভীর মুখে বলিল—একটা কথা বলি শোন। তুমি ও টাকা নিতে পারবে না। ছেড়ে দাও অমনি।

শান্তিরাম অবাক হইয়া বলিল—এমনি ছেড়ে দেব! কেন? বেশ তো তুমি—

নীরদা বলিল—চিনু আমাকে বড় ভালবাসে। এখানে ছাড়া সে কোথাও যায় না আসে না। দুটি চালভাজা দিই তাই হাসিমুখে বসে বসে খায়। মেয়ের মতো মায়া হয়েছে ওর ওপর, ওদের কাছ থেকে তুমি ওই ডোবা বেচে টাকা নিতে পারবে না—আর যে টাকা নেয় নয়, তা কখনও নিতে পারবে না তুমি।

—তবে চলবে কি করে শুনি? এ টাকা ছাড়লে কিসে থেকে কি হবে?

—তা যাই হোক! ওরা বড়মানুষ বটে, কিন্তু গাঁয়ে সবাই ওদের ঠকিয়ে নিচ্ছে ছেলে-মানুষ পেয়ে—তা বলে তুমি তা নিতে পারবে না। এতে আমাদের ভাগ্যে যা আছে! তুমি নিলে আমি অনশ্ব বাধাব বলে দিচ্ছি।

স্ত্রীকে শান্তিরাম ভয় করিত। কাজেই যখন অন্য সরিকেরা ডোবার অংশের দাম বড়জোর গণ্ডায় বুঝিয়া পাইল, শান্তিরাম কিছুতেই টাকা লইল না। সুশান্তকে বলিল—পশুপতি দাদার

ইচ্ছেতে তাঁর বাবার নামে পুকুর হবে, আমি তাতে টাকা নিতে পারব না। এমনি লিখে দিচ্ছি আমার অংশ। ও অনুরোধ ক'রো না বাবা!

রাত্রে সে স্ত্রীকে বলিল—কথায় বলে স্ত্রীবুদ্ধি! তুমি টাকা নিতে দিলে না, এখন কর উপোস! বত্রিশ টাকায় ছুটি মাস ভাবতে হতো না। এখন আমি কোথা থেকে কি করি, এই পুজো আসছে সামনে, অন্তত ওদের কাপড় কিনে দিতে পারতাম তো—

নীরদা বলিল—ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় করে সে টাকায় আমার ছেলেমেয়ের কাপড় কিনতে হবে না। ওরা কাপড় এবার না হয় পরবে না। যেমন চিনু তেমনি ওর দাদা—ওরা ছেলেমানুষ। ওদের কাছ থেকে দম দিয়ে অন্যায় টাকা আদায় করে কদিন খাবে? বেশ করেছ ছেড়ে দিয়েছ।

টাকাটা হাতছাড়া হওয়াতে শান্তিরাম দুঃখিত হইল বটে কিন্তু স্ত্রীর এ নূতন মূর্ত্তি তাহার কাছে লাগিল ভাল। সোনার বালার শোকে স্ত্রীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, ইহা তাহার বিপরীত; নীরদা—না, বেশ লোক। এ জিনিস যে আবার নীরদার মধ্যে আছে—

বলিল—শোন, ওপাড়ার মহেশদাদা তো এক শরিক! আমায় ডেকে পরশু বলছে—হ্যাঁ হে, তোমরা নাকি বত্রিশ টাকা করে অংশ ধার্য্য করেছ? আমি আমার অংশ পঞ্চাশ টাকার কমে দেব না। ওদের গরজ পড়েছে, বড়লোক, যা চাইবো তাই দিতে হবে। ও খাশ ব্রহ্মোত্তর, ছাড়বো কেন অত সহজে? সত্যি যা বলেছ, সুশান্তকে ভালমানুষ পেয়ে ওরা দম দিয়ে বেশী টাকা আদায় করেছে।

—করে থাকে করেছে। যার ধর্ম্ম তার কাছে। ও টাকা কদিন খেতে? ও কথা বাদ দাও। পুকুর কাটিয়ে দেবে ওরা একগাদা টাকা খরচ করে কিন্তু জল খাবে পাড়ার পাঁচজনেই তো? ওরা সেই পশ্চিম থেকে কিছু পুকুরের জল খেতে আসছে না। আমাদের সুবিধের জন্যেই ওরা করে দিচ্ছে। চিনু বলেছিল, ওর দাদা পরের কাজে, দেশের কাজে বড় মন দিয়েছে। বেশ ছেলেটি।

পূজার দিন কয়েক বাকি।

সুশান্ত সন্ধ্যার সময় শান্তিরামের বাড়ী আসিল। বলিল—কাকা, আমরা কাল চলে যাচ্ছি পশ্চিমে। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। আপনার উপর একটা ভার দিয়ে যেতে চাই। পুকুর কাটানোর ভারটা আপনি নিন। গাঁয়ের মধ্যে আপনি অনেস্ট লোক দেখলুম। চিনুর মুখে আপনাদের সব কথা আমি শুনেছি। একটা প্রস্তাব আছে আমার, যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি। আমি এই পুকুর কাটানোর আর আমাদের জমিজমা বাড়ীঘর এখানে যা আছে তা দেখাশুনা করবার জন্যে মাসে আপনাকে পনেরো টাকা দেবো। পুকুর কাটানো হয়ে গেলে আমাদের বাড়ীটা মেরামত করবার ভারও আপনার ওপর থাকবে। আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে খালাস হবো। মাঘ মাসের দিকে মাকে নিয়ে এসে পুকুর প্রতিষ্ঠা করে যাবো। বলুন কাকা, এতে আপনি রাজী আছেন—রাজী না হলে

ছাড়ছি নে, গাঁয়ে আর লোক নেই। আর আমাদের যাওয়ার আগে আপনার তুমাসের টাকা দিয়ে যাবো—কেন না, পুজো আসছে, খরচপত্র আছে তো? পুকুর-কাটার দরুনও আপাততঃ এগুলো টাকা আপনার হাতে দিয়ে যেতে চাই—আপনাকে সকলে গাঁয়ে বলে হোটেলওয়ালা বামুন, কিন্তু দেখছি আপনিই খাঁটি লোক।

শান্তিরামের মাথা ঘুরিয়া গেল। ছোকরা আরও সব যে কি বলিয়া গেল শান্তিরামের মাথার মধ্যে কিছু ঢুকিল না। সুশান্ত চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—ওগো কোথায় গেলে, শুনছো—শোন শোন—

নীরদা সব শুনিয়া হাসিমুখে বলিল—স্ত্রীবুদ্ধি বলছিলে যে? আমার বুদ্ধি নিয়ে চলো একটু।

ফিরিওয়ালা

অনেক দিন আগে বাল্যজীবনে যখন কলকাতায় এসে কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করি, তখন হ্যারিসন রোডের একটা ছাত্রদের মেসে থাকতাম।

একজন ফিরিওয়ালা সে-সময় প্রত্যহ আমাদের মেসে আসত, তার মাথায় একটা চেপ্‌টা গড়নের হাঁড়ি—তাতে থাকত ক্ষীরমোহন ও রসগোল্লা। লোকটা সত্যিই ভারি চমৎকার ক্ষীরমোহন তৈরি করতে পারত—এবং তার চেয়েও বড় গুণ ছিল লোকটার,—সে ধারে খাবার দিয়ে যেত মেসের ছেলেদের।

মেসে জিনিসপত্র যারা বিক্রি করে, ধার না দিলে তাদের ব্যবসাই চলে না—একথা তাদের চেয়ে ভালভাবে কেউ বুঝত না। ধারও যেমন তেমন ধার নয়, মেসের ছেলেরা নির্ব্বিবাদে দিনের পর দিন খেয়ে চলেছে, মাস শেষ হলে দেখা গেল, ফিরিওয়ালার ক্ষীরমোহনের দেনা দাঁড়িয়েছে এক-একজনের কাছে দশ টাকা, পনেরো টাকা। মজা হচ্ছে এই যে, টাকা শোধ না হলেও এসব ক্ষেত্রে ধার দিয়েই যেতে হবে—কারণ খাবার খাইয়ে না যেতে পারলে টাকা কখনই আদায় হবে না।

ক্ষীরমোহনওয়ালার মুখে বিনয়ের হাসি সর্ব্বদাই লেগে থাকত, আমি কখনো তার হাসিমুখ ছাড়া দেখিনি অন্ততঃ। ও এলেই বড় ভাল লাগত—ওর মুখের মজার মজার হাসির গল্প শুনতে। মেসের ছেলেরা গল্প শুনতে শুনতে চার পাঁচ টাকার খাবার খেয়ে ফেলত সবাই মিলে।

লোকটার চেহারা ছিল ভাল। বেশ দোহারা গঠনের, রং একটু ফর্সা, বড় বড় গোঁপ জোড়া দেখলেই আমাদের খুব হাসি পেত, তার ওপরে ওর মুখে ওর দেশের নানান রকম মজার গল্প শুনতে গিয়ে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরবার উপক্রম হত।

ঘড়ির কাঁটার মত লোকটা আসত আমাদের মেসে।

ঠিক সাতটা যে-ই বাজল, মুখ ধুয়ে উঠে সবাই বলেছে, এইবার চা আর খাবার আনবার দরকার, অমনি দেখা গেল ক্ষীরমোহনওয়ালা তার চেপ্‌টা হাঁড়ি মাথায় করে হাজির হয়েছে। দুঘণ্টা ধরে নানারকম হাসির গল্পের মধ্যে বেচা-কেনা নিষ্পন্ন করে সে তার চেপ্‌টা হাঁড়িটা মাথায় তুলে আবার ফিরে যেত। এই রকম দুই তিন বছর কেটে গেল।

তারপর আমাদের মেস গেল ভেঙে, আমিও অন্যত্র গিয়ে উঠলাম। দিনকতক পরে আমার নতুন মেসে আবার সেই ফিরিওয়ালা গিয়ে হাজির।

মেসের ছেলেদের মন কি করে পেতে হয়, এ আর্ট ভালভাবে জানা ছিল লোকটার। মাসখানেক যেতে না যেতে ও এখানেও সবার অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। এক হাঁড়ি করে প্রতিদিন বিক্রি হতে লাগল এ মেসেও। একদিন ক্ষীরমোহনওয়ালা (ওর নামটা বোধ হয় ছিল পঞ্চানন, কিন্তু ওর নাম ধরে কেউ কোনদিন ডাকেনি, কাজেই ঠিক মনে নেই) এসে আমাদের হাতজোড় করে বল্লে—বাবুমশাইরা, আমার ছেলের বিয়ের আজ বৌভাত, আপনাদের দোরে খেয়েই তো আমি মানুষ। আপনারা সবাই আমার মনিব। বলতে সাহস পাইনে, তবে যদি আপনারা দয়া করে আমার ওখানে আজ পায়ের ধুলো দিয়ে মিষ্টিমুখ করে আসেন, তবে বড় খুশী হই।

মেসের অনেকে গেল, কি কারণে আমার যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া ঘটে নি। যারা গিয়েছিল তারা ফিরে এসে ফিরিওয়ালার খাতির ও যত্ন আতিথ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করলে।

বেলেঘাটা অঞ্চলে কোথায় একটা ছোট্ট খোলার বাড়ীতে ফিরিওয়ালার বাসা। তারই সামনে অন্য একখানা খোলার বাড়ীর বাইরের ঘরে ওদের বসবার জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা হয়েছিল। পান তো ছিলই, এমন কি কাঁচি সিগারেটের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। মেসের ছেলেরা নববধূর জন্যে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিল। বৌটিও বেশই হয়েছে সবাই বল্লে, তবে বয়েস কম, এগারো বছরের বেশী নয়—ছেলের বয়েসই সবে ষোল বছর।

তারপর ফিরিওয়ালা সকলকে পরিতোষ করে খাইয়ে ছেড়েছে—লুচি, তরকারি, মাছ, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। খাওয়ার পর আবার পান সিগারেট। একজন সামান্য ফিরিওয়ালা যে এমন চমৎকার খাতির যত্ন করবে ভদ্রলোকের ছেলেদের, সেটা এমন বেশী কথা কিছু নয়, কিন্তু তার আয়োজন যে এমন ত্রুটিশূন্য হবে, তার ঘর দোর, বসবার বিছানা যে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এটাই অনেকে আশা করেনি। এমন কি, যাবার সময়ে সকলে ঠিক করেই গিয়েছিল, যাচ্ছি বটে—নিতান্ত গরীব লোকটা নিমন্ত্রণ করে ফেলেছে, না গেলে মনঃক্ষুণ্ন হবে তাই যাওয়া। ওর ছেলের বউয়ের মুখদেখানি স্বরূপ কিছু কিছু ওর হাতে দিয়েই চলে আসবে, কিছু খাবে না কেউ সেখানে। তার পরিবর্ত্তে তারা যা দেখলে, তা আশাতীত বটে তাদের পক্ষে। দুতিন-দিন ধরে মেসে ফিরিওয়ালা ছেলের বিয়েরই কথাই চলল।

তারপর আবার ফিরিওয়ালা মেসে আসতে লাগল। আগের চেয়ে তার দশগুণ

খাতির বেড়ে গেল আমাদের মেসে। ক্ষীরমোহন এক হাঁড়ি করে উঠত আগে—এখন দুবেলা ওঠে দু-হাঁড়ি।

ধড়িবাজ ব্যবসাদারও বটে লোকটা।

আরও বছর দুই পরে আমার ছাত্রজীবন শেষ হল, আমি কলকাতার বাইরে গেলাম চাকুরি নিয়ে এবং সেখানে সাত আট বছর কাটিয়ে দিলাম। কলকাতার জীবন ক্রমশঃ দূরের হয়ে গেল—মেসের কথা, পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের কথা আর তেমন করে ভাবিনে। সেবার পূজার পূর্ব্বে বিশেষ কি কাজে কলকাতায় এসে দেখলাম, আমার পূর্ব্ব-পরিচিত সেই ক্ষীরমোহনওয়ালা হাঁড়ি মাথায় নিয়ে মেসে খাবার বিক্রী করতে এসেছে।

আমি বল্লাম—কিগো, চিনতে পার?

ফিরিওয়ালা আমায় দেখে চিনতে পারলে, খুব খুশী হল। প্রণাম করে বললে—বাবুমশাই, চিনতে পারব না আপনাদের? আপনাদের দোরে খেয়ে মানুষ আর আপনাদেরই চিনব না? তা এখন কোথায় আছেন? অনেক কাল আপনাকে দেখিনি। বিয়ে-থা করেছেন বাবু? ছেলেপিলে হয়েছেন?

আমি আমার সব খবর মোটামুটি তাকে দিয়ে জিগ্যেস করলাম—তোমার সব খবর ভাল? আছ কেমন? তোমার ছেলেটি এখন কি করে?

লোকটা চুপ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বাবু, সে নেই।

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—তোমার ছেলেটি নেই! মারা গিয়েছে? কতদিন হল?

ফিরিওয়ালার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। ময়লা কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছে বললে—বাবু, তার কি হয়েছে তা যদি জানতাম, তা হলে তো মনটা শান্ত হত। আর বছর মাঘ মাসে একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল বৌবাজার যাব বলে। বৌবাজারে আমাদের দেশের একজন লোকের মুদিখানার দোকান আছে। সেই যে বাবু গেল, আর এল না।

—খুঁজেছিলে?

—খোঁজার কি কিছু বাকি রেখেছিলাম বাবু? সব হাসপাতাল সব জায়গা খোঁজ করেছিলাম—কোন সন্ধান নেই। এখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছি বাবু। আপনার সঙ্গে একটা কথা বলব—কাল থাকবেন?

পরদিন সকালে ফিরিওয়ালা আবার এসে আমার ঘরের দোরের সামনে দাঁড়াল। বললাম—এস, ঘরের মধ্যে এস, কেউ নেই—কি কথা বলবে বলছিলে?—

—বাবু, আপনি একটু খবরের কাগজে লিখে দেবেন ছেলের কথাটা? আমায় লোকে বলে তুমি কাগজে লিখে দাও, তা হলে ছেলে পাওয়া যায়। দেবেন লিখে বাবু?

কোথায় কি লিখে দেব বুঝতে পারলুম না। এতদিন পরে লিখে দিলেও যে বিশেষ কোন ফল হবে, সে সম্বন্ধে আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবুও পুত্রশোকার্ত্ত পিতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্লুম, আচ্ছা, তুমি বলে যাও, আমি লিখে নিই। কি রকম দেখতে ছিল

তোমার ছেলে? বয়েস কত?

কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে আমি নিজের খরচে দু'তিনখানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেলাম। বাবা ননী, ফিরে এস, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়, যদি শেষ দেখা করতে চাও—ইত্যাদি।

এর ফলাফলের কথা আমি কিছু জানিনে—কারণ তিনচার দিনের মধ্যেই আমি আবার কলকাতা থেকে চলে গেলাম।

পুনরায় কলকাতায় ফিরলুম দু-বছর পরে।

কলকাতায় এবার এসেছিলাম খুব অল্পদিনের জন্যে, আগের সেই মেসটাতেই উঠেছিলাম—কিন্তু ফিরিওয়ালাকে এবার আর দেখলাম না সেখানে, তার কথা যে খুব মনে ছিল, তাও নয়।

নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরতাম, অন্য কারও কথা ভাববার অবকাশ ছিল কোথায়?

হয়তো বা ওকে দেখলে সব কথা মনে পড়ত, কিন্তু তা হয় নি।

তারপর আবার চলে গেলুম কলকাতা থেকে।

বিদেশে থাকবার সময়ে অবসর-সময়ে আমার মাঝে মাঝে দু-একবার ফিরিওয়ালা ও তার ছেলের কথা মনে হত—তারপরে একেবারে ভুলে গেলাম।

ন-বছর পরে বিদেশে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এসে কলকাতাতেই চাকুরির খোঁজে এলাম, মাস কয়েক পরে একটা চাকুরি পেয়েও গেলাম।

মেসেই থাকি। পূর্ব্বে যে অঞ্চলে থাকতাম, সেই অঞ্চলে বটে, তবে অন্য বাড়ীতে। হঠাৎ একদিন দেখি সেই ফিরিওয়ালা। সেই চেপ্‌টা ধরনের হাঁড়িতে ক্ষীরমোহন ভরা, আগেকার মতই। ওকে দেখে কি জানি কেন, আমি হঠাৎ বড় খুশী হয়ে উঠলুম। এই যে মেসে এসে উঠেছি এখানে সবাই অপরিচিত, এদের সঙ্গে আমার মনের কোন যোগই নেই কোন দিক দিয়ে। এই অজ্ঞাত ব্যক্তিদের ভিড়ের মধ্যে এই লোকটিই একমাত্র আমার বহুদিনের পরিচিত—আমার বহুকাল পূর্ব্বের ছাত্রজীবনের সঙ্গে কেবল এই লোকটিরই যোগ আছে—আর কারও নেই এখানকার মধ্যে।

আমাকে কিন্তু ও প্রথমটাতে আদৌ চিনতে পারেনি। আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছিল এর মধ্যে, বয়েসেও হয়েছিল, হবারই কথা—আমার বর্ত্তমান জীবন ও ছাত্রজীবনের মধ্যে কুড়ি-একুশ বৎসরের ব্যবধান।

এখনও লোকটা ঠিক সেই আগের দিনের মতই সেই একই ধরনের চেপ্‌টা হাঁড়ি মাথায় করে মেসে মেসে ক্ষীরমোহন ফিরি করে বেড়ায়।

ওকে ডাকলুম। ক্ষীরমোহন কিনে পয়সা দেবার সময় ও আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দু-একবার, কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না।

আমি বল্লুম—কি, চিনতে পারো?

ফিরিওয়ালা হাতজোড় করে প্রণাম করে বল্লে—তাই চেয়ে চেয়ে দেখছি, বাবুমশাই না?...তা এখন আর চোখে তেমন তেজ নেই আগেকার মত। এতদিন কোথায় ছিলেন বাবু?

ফিরিওয়ালার চেহারার কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি। দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—মাথার চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি, মুখের চেহারা ঠিক তেমনি আছে।

বল্লাম—আমি দেখছি—তোমার চেহারা রাখলে কি করে? কিছুই বদলায়নি, মনে হচ্ছে যখন হ্যারিসন রোডের মেসে খেতে, সে যেন কালকের কথা।

ফিরিওয়ালা বল্লে—আর বাবুমশাই, চেহারা!

হঠাৎ মনে পড়ল ওর নিরুদ্দিষ্ট ছেলের কথা। আগে মনে হওয়াই উচিত ছিল সেটা, কিন্তু তা হয় নি। একটু ইতস্ততঃ করে জিগ্যেস করলুম—হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার সেই ছেলেটি—

ফিরিওয়ালা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না বাবু, সে সেই যে চলে গেছে, সেই শেষ।

খুব দুঃখিত হলাম শুনে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও তাহলে কোন কাজ হয়নি!

—ছেলের বৌটি কোথায়?

—আমার কাছেই আছে বাবুমশায়, আর কোথায় যাবে?

—এখন আছ কোথায়?

—বেলেঘাটায় সেই বাসাতেই।

—তোমার স্ত্রী আছে তো?

—না বাবু—সেও আজ চার বছর হলো মারা গিয়েছে। ছেলের নিরুদ্দেশের পর তার শরীর সেই যে ভেঙে গেল, আর তো ভাল হয়নি। বাবু এসে পড়েছেন, ভাল হয়েছে—

—কেন বল তো?

—আমাকে কিছু সাহায্য করুন বাবুমশাই। বারো বছর হয়ে গেল, এবার খোকার কুশপুতুল দাহ করে শ্রাদ্ধ করব। বিধেন নিয়েছি ভটচাযি মশায়ের কাছ থেকে। আমার তেমন রোজগার-পাতি নেই আজকাল—ভিক্ষেশিক্ষে করে ছেলের কাজটা করব—

ওকে একটি টাকার বেশী দিতে পারলাম না—নিজেরই চাকুরির অবস্থা সুবিধে নয়, মেসের খরচ চালানোই দুর্ঘট হয়ে পড়েছে।

দিন পনেরো পরে ফিরিওয়ালা এসে আমায় বল্লে—বাবু, আজ আমার ছেলের কাজ, আপনি একটু পায়ের ধুলো যদি দেন গরীবের বাড়ীতে, ছোট মুখে বলতে সাহস হয় না আপনাকে—আপনার দয়া—

ওর অনুরোধ এড়াতে পারলুম না—মন সরলো না। বহুদিনের যোগাযোগ ওর সঙ্গে। আমার ছাত্রজীবনের আমলের আর কোন পরিচিত লোক কলকাতায় নেই—এই ফিরিওয়ালা ছাড়া। যেতেই হলো।

ও একটা ঠিকানা আমায় দিয়ে গেল বেলেঘাটার—যে অঞ্চলে জীবনে কখনো যাইনি,

যাবার প্রয়োজনও হয়নি এতদিন। একটা বস্তির খানকুড়ি বাইশ ঘরের মধ্যে অতি কষ্টে ওর ঘর খুঁজে বার করলুম। সামনে একটা ডোবা। সামনে একটা নীচু খোলার ঘরে ফিরিওয়ালা আমায় নিয়ে গিয়ে যত্ন করে বসালে। কেওড়া কাঠের তক্তপোশের ওপর পুরু করে বিছানা পাতা। আমি আসাতে ফিরিওয়ালা যে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে ওর প্রত্যেক কথার মধ্যে, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গির মধ্যে তার প্রকাশ।

আমি জিগ্যেস করলাম—এ বাড়ীতে কতদিন আছ?

—আজ ত্রিশ বছর বাবু, এ বাড়ীতে আমার খোকা জন্মায়—

তারপর সে ব্যস্ত হয়ে, কোথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই একবাক্স সিগারেট এনে আমার সামনে রেখে দিয়ে বল্লে—নিন, বেশ আরাম করুন বাবু, গরীবের কুঁড়ের যখন এসেছেন—

ওর হাব-ভাব দেখে মনে হবার কথা নয় যে আজ ওর পুত্রের শ্রাদ্ধ। যেন কোন উৎসব আনন্দের কাজ চলছে বাড়ীতে। আমার মনে কেমন সঙ্কোচের ভাব এল, আমি এসেছি বলে আমার খাতির করতে গিয়ে ওকে উৎসবের মতই আয়োজন করতে হয়েছে।

আমায় বল্লে—আমার খোকার যখন বিয়ে হয়, আজ অনেকদিন আগেকার কথা—তখন আপনাদের সেই পুরোনো মেসের রমেশবাবু, হরিধনবাবু, গোপালবাবু, সতীশবাবু ওঁরা সব এসে এই ঘরে এই তক্তপোশেই বসেছিলেন। বড় ভাল লোক ছিলেন ওঁরা। রমেশবাবু ওইখানটাতে বসে চা আর খাবার খেলেন, আমার আজও মনে আছে। সতীশবাবু বল্লেন—ওহে, গরম গরম লুচি নিয়ে এস তো? আমি তখন খোলা চড়িয়ে আমার স্ত্রীকে দিয়ে আলাদা করে গরম লুচি ভাজাই—খেয়ে তাঁদের কি ফুর্তি বাবুমশাই! বল্লেন—বেশ করেছ, বেশ করেছ—আহা কি সব লোকই ছিল তখন। পান এনে দি বাবু, বসুন—

আমি সত্যিই অস্বস্তিবোধ করছিলুম। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল ওর ছেলের বিয়েতে সেদিন—বহুবছর আগের কথা—বিশ-বাইশ বছর হবে, সে কথা আমার মনে ছিল না, আজ ওর কথায় মনে হল।

তখন কেন আসা হয়নি জানিনে—এতকাল পরে সেই ছেলের শ্রাদ্ধতে এসেছি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

লোকটা কিন্তু আমায় নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমি ওর বাড়ীতে এসেছি, এ যেন ওর কাছে মহাগুহ্য ঘটনা। বারবার সে আমার কাছে এসে আমার সুবিধা অসুবিধা দেখতে লাগল। বিশ বৎসর আগে যখন আমার মেসের বন্ধুরা ওর বাড়ীতে এসেছিল ওর ছেলের বিবাহে, সেও ওর জীবনে দেখলুম এক অতি স্মরণীয় দিন হয়ে আছে—ঘুরে-ফিরে বারবার ও সেই কথাই পাড়তে লাগল।

—রমেশবাবুরা এলেন, তা আমি ওঁদের জন্যে সব আলাদা বন্দোবস্ত করেছিলাম। ফিরিওয়ালার কাজ করি বটে বাবু, কিন্তু আমি মানুষ চিনি বাবুমশাই। হরিধনবাবু বল্লেন—তুমি ক্ষীরমোহন বিক্রী কর, তোমার ছেলের বিয়েতে আমরা পেট ভরে ক্ষীরমোহন খাব। নিয়ে

এস ক্ষীরমোহন। আমি বড় হাঁড়ির একহাঁড়ি ক্ষীরমোহন ওঁদের জন্যে আলাদা করে রেখে-ছিলাম। সতীশবাবু, রমেশবাবু খেয়ে খুব খুশী—তার পরের হপ্তায় সতীশবাবু আমায় পাঁচ সের ক্ষীরমোহনের অর্ডার দেন, বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে—

আমি বল্লাম—বিশ বছর আগেকার কথা তোমার এত খুঁটিনাটি মনে আছে?

ফিরিওয়ালা বল্লে—তা থাকবে না বাবু? আপনারা তো আমার বাড়ীতে রোজ রোজ পায়ের ধুলো দিচ্ছেন না। জন্মের মধ্যে কর্ম্ম একটা দিন। তা মনে থাকবে না!

আর কিছুক্ষণ পরে আমি আরও গোটাদুই পান খেয়ে উঠবার চেষ্টা করছি, ফিরিওয়ালা জিভ কেটে বল্লে—তা কি হয় বাবু? এসেছেন যখন তখন—

আমি বল্লাম—না, শোন! আমি কিছু খেতে পারব না আজ—এ যদি আনন্দের কাজ হত আমি—

—ও কথাই মুখে আনবেন না বাবু। আপনারা আমার মা বাপ—আমার খোকার সদ্গতি হবে না আপনি আজ এখানে সেবা না করলে—ব্রাহ্মণ দেবতা আপনি—

অগত্যা কিছু খেতেই হল।

পাশের ঘরে আমার জন্যে পরিপাটি করে খাবার আসন পাতা। একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের বিধবা যুবতী আধ-ঘোমটা দিয়ে আমায় খাবারের থালা দিতে এল।

ফিরিওয়ালা বল্লে, এই আমার বৌমা। গড় কর বৌমা, ওঁদের খেয়েই আমরা মানুষ—ব্রাহ্মণ দেবতা—

বৌটি গলায় আঁচল দিয়ে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

ফিরিওয়ালা কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বল্লে—বৌমা বড় ভাল মেয়ে মশাই। খোকা যখন আমায় ছেড়ে পালাল, তখন বৌমার কাঁচা বয়েস, এই আঠারো কি উনিশ। সেই থেকে এই সংসারেই আছে, গরীবের সংসার, কখনো ভাল মন্দ খাওয়াতে পরাতে পারিনি। মুখ বুজে সব সহ্য করে এসেছে। আমার পরিবার ওর ওপর একটু অত্যাচার করত, মিথ্যে কথা বলব না, দেবতা আপনারা: বলত তুই অলুক্ষুণে বৌ ঘরে এলি, আর ছেলে আমার দেশছাড়া হল। একদিনের জন্যেও বৌমা ব্যাজার হয়নি সে সব শুনে। এখন তো আর কেউ নেই—ও আছে আর আমি আছি। ওই আমার মা, ওই আমার মেয়ে—

ফিরিওয়ালার পুত্রবধূ ইতিমধ্যে দই আনতে গিয়েছিল বাড়ীর মধ্যে।

আমি বল্লাম—তোমার বৌমা বরাবর তোমার কাছেই আছে?…বাপের বাড়ী কোথায়? সেখানে মাঝে মাঝে যাতায়াত আছে তো?…

—কোথায় বাবুমশাই? ওর তিন কুলে কেউ নেই। তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি, বয়েস হয়েছে, আজ যদি চোখ বুজি, আমি তো বেশ যাব, পুত্রশোক জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু বৌমার কথা যখন ভাবি, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। কার কাছে রেখে যাব ওকে, সোমত্ত বয়েস, এক পয়সা দিয়ে যেতে পারব না। কখনো ঘরের চৌকাঠের বাইরে পা দেয় নি কি খাবে, কোথায় যাবে।

—ও কি বাবুমশাই, তা হবে না, ও কখনো ফেলে উঠতে পারবেন না, খেতেই হবে।

আহারাদি শেষ করে চলে আসবার সময় বিধবা মেয়েটি পান এনে রাখলে সামনে। তারপর আবার তার শ্বশুর ও সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

এরও বছরখানেক পরে পর্য্যন্ত ফিরিওয়ালা নিয়মিত ভাবে আমাদের মেসে খাবার ফিরি করতে আসত। তারপর গত বৎসর পূজোর ছুটির আগে থেকে ও আর এল না। এখনও পর্য্যন্ত একদিনও আর তাকে দেখা যায় নি। মাঝে মাঝে লোকটার কথা মনে হয়—বেঁচে আছে না মরে গেল! খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল অবিশ্যি—কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি।

নিষ্ফলা

—আ মর্! এগিয়ে আসছে দেখ না। দূর হ, দূর হ। ওমা আমি কোথায় যাব? এ যে ঘরে আসতে চায়। ছিঃ ছিঃ! ধর্ম-কর্ম সব গেল। বলি ও ভালমানুষের মেয়ে, এমনি করে কি লোককে পাগল করতে হয়?

বেলা বেশী নয়, আটটা হইবে প্রায়। বৈশাখ মাস—বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। পাশের বাড়ীর গৃহিণী আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন তাঁহার পূজার ঘরে। পূজার ঘরটি ত্রিতলে। সেইখানে বাড়ীর দুষ্ট কুকুরটি দরজায় আসিয়া উঁকি মারিল। নামাবলীতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ছোট একটি আরশি দেখিয়া নাকের উপর তিলক কাটিতে কাটিতে কুকুরের মুখদর্শন করিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত হইতে সশব্দে তিলক-মাটি পড়িয়া গেল। তিনি তখন পূজায় বাধা পড়িতে দেখিয়া চকিতে ঠাকুরঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া ভীত-কণ্ঠে ঐ কথাগুলি বলিতে শুরু করিলেন। নীচের তলায় বধূটি স্নান করিতেছিল। সে মুহূর্ত্তে ভিজা কাপড়েই দৌড়াইতে দৌড়াইতে উপরে আসিয়া কুকুরটিকে কোলে লইয়া বলিল—বেবী, তুই বড় দুষ্টু হয়েছিস্। একদিন না এখানে আসতে বারণ করেছি!

কথা-শেষে সে বেবীর পিঠে মৃদু করাঘাত করিল। বেবী ভারী খুশী হইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে ফিরিয়া ডাকিল, ঘেউ-ঘেউ!

বিপদ কাটিয়া যাইতে দেখিয়া শাশুড়ী নির্ভয়ে পুনরায় পূজার ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন; বধূকে বলিলেন, দেখো গা বাছা, কুকুরকে অত আদর দেওয়া ভাল নয়। কথায় আছে না, কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে! সব জিনিসের একটা সীমা আছে।

বধূটি প্রতিবাদ করিল, কি অত আদর দিতে দেখলেন?

—ওই ত, তোমাদের সব তাতেই তর্ক। একটা কুকুরকে কোলে করে ধেই ধেই করে নাচাটা খুব ভাল, না?

বধূ আর কোন কথা না বলিয়া কুকুরটিকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গল্পটি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটু গোড়ার কথা বলা দরকার। মাস দুয়েক আগে পঞ্চাননতলায় একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে সকালবেলা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সেই গলির মধ্যে ডাস্টবিনের কাছে কাহাদের একটি কুকুরের ছানা পড়িয়া রহিয়াছে। বয়স তাহার বেশী নয়, এখনও চোখ ফোটে নাই। বেচারা ঈষৎ নড়িয়া চড়িয়া মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে লাগিল। কাহার এই দুঃসাহস যে নিঃশব্দে রাত্রিকালে চুপি চুপি নিষ্ঠুরের মত এই দুর্ভাগা ছানাটিকে এইরূপে ফেলিয়া যাইতে পারিল? ছানাটির মৃত্যু সুনিশ্চিত। প্রথমত না খাইয়া মরিতে পারে—দ্বিতীয়ত কোন শত্রুর আক্রমণেও মরিতে পারে। অগত্যা বেচারাকে রক্ষা করিবার জন্য সকলে আকুল হইয়া পড়িল, অথচ কেহই সাহস করিয়া তাহার ভার লইতে চাহিল না। পরিশেষে ঐ বধূটির স্বামী স্ত্রীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ভিজা গামছা পরিয়া কুকুরটিকে নিজ গৃহে লইয়া গেল। নিঃসন্তান বধূটি তাহাকে মাতার স্নেহে পালন করিতে লাগিল। 'কুকুরের জীবটি'র উপর তাহার অনুর্ব্বর জীবনের স্নেহবাৎসল্যের প্রবল বন্যা বহাইয়া দিল। দিনে দিনে তাহার সুপ্ত স্নেহ ঐ কুকুরটিকে জড়াইয়া বিরাট মহীরুহ সৃষ্টি করিতে লাগিল। কুকুরটির নাম-করণ হইল 'বেবী'। কিন্তু এই বেবীকে উপলক্ষ করিয়া বধূটির সহিত তাহার শাশুড়ীর মনোমালিন্য হইল। শাশুড়ী প্রাচীন-পন্থী বিধবা মানুষ। তিনি তাঁহার পূজা-আহ্নিক লইয়া দিনের চব্বিশটি ঘণ্টা কাটাইয়া দেন। সংসারে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ভোর রাত্রে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়া যান, রোদ উঠিলেই ফিরিয়া তাঁহার ত্রিতলের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া গৃহদেবতার সেবা করেন। সন্ধ্যায় নিত্য বৈষ্ণব বাবাজীরা হরিনাম করিয়া গৃহ পবিত্র করিয়া যায়। বার মাসে তের পার্ব্বণ। গঙ্গাজল আর গোময় লেপন করিতে করিতে সারা বাড়ী শুদ্ধ করিয়াই কাটাইয়া দেন। এ হেন শাশুড়ী ঐ অপবিত্র প্রাণীটিকে তাঁহার সুপবিত্র গৃহ কলুষিত করিতে দেখিলে যে খড়্গহস্ত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বধূটি শাশুড়ীকে যে অমান্য করে তাহাও বলা যায় না, কিন্তু এক্ষেত্রে কেন জানি না সে বাঁকিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্বামী অকস্মাৎ আশ্চর্য্যরূপে মূক হইয়া পড়িল। যেমন বেবী দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল তেমনই তাহাদের কলহও প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। শাশুড়ী বলিলেন, ছিঃ ছিঃ, এত স্লেচ্ছপনা কি সহ্য হয়? হারামজাদা ছিষ্টি রৈ রৈ করছে। এ বাড়ীর ছায়া মাড়াতে পর্য্যন্ত গা ঘিন ঘিন করে। এমন সোনার সংসার ছারখার করে দিলে। আমার যে দুদিন কোথাও গিয়ে থাকবার চুলো নেই। কত লোকের কুকুর দেখেছি বাপু, এমন বাড়াবাড়ি কোথাও দেখিনি। তাদের কুকুর থাকে বার-বাড়ীতে বাঁধা। আর এনার কুকুরের শোবার ঘর নইলে রাতে ঘুম হয় না। জান দিদি, কুকুর দিন-রাত্তির খাটের ওপর শুয়ে থাকে।

বারমাস গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি অনেক পথের দিদি জুটাইয়াছেন। সেই পথের দিদিই সবিস্ময়ে কহিলেন, ওমা, আমি কোথায় যাব!

শাশুড়ী বলিলেন, শুধু কি তাই? কুকুরকে কোলে নিয়ে আটপহর কি আদর করেন—তাকে চুমু খাবার কি ঘটা!

—একেবারে সাহেবীয়ানা।

স্বামী ভুলিয়াও কোন দিন প্রতিবাদ করে নাই বা প্রশ্রয়ও দেয় নাই। মাঝে মাঝে দৈবাৎ কখনও হয়ত বলিল, বেবী এসে অবধি আমার অবস্থা বড় কাহিল হয়ে গেছে।

বেবীর কান দুইটি দুই হাত দিয়া ঈষৎ চাপিতে চাপিতে দুটি ভাগর চোখে স্বামীর পানে তাকাইয়া স্ত্রী প্রশ্ন করিল, তার মানে?

স্বামী বলিল, মানে, আমাকে তুমি কম ভালবাসছ। কারণ চব্বিশ ঘণ্টা বেবী হারামজাদাকে নিয়ে থাকলে আমি-বেচারার কথাটা স্মরণ হওয়া তোমার দায় হয়ে উঠেছে।

অমনি স্ত্রী অভিমানের সুরে কহিল, ওঃ! বেবীর ওপর তোমাদের বাড়ীসুদ্ধ সকলের হিংসে! ওকে গলা টিপে মেরে ফেললে তোমাদের ষোলকলা পূর্ণ হয়, না?

বধূটির গণ্ড বাহিয়া অশ্রুকণা ঝরিতে লাগিল। স্ত্রীকে কাঁদিতে দেখিয়া স্বামীর চিত্তও বিচলিত হইল, ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, অমনি রাগ হল রমা? ঠাট্টাও বোঝ না? যা-হোক মানুষ!

রমা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কহিল, আমি বেশ জানি, এ তোমাদের ঠাট্টা নয়। তোমাদের মনের কথা। বেশ, দূর করে বিদেয় করে দেব একে। দূর হ! দূর হ হারামজাদা!

কথা শেষে সে বেবীকে মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। বেবী কেঁউ কেঁউ করিয়া তাহার ব্যথা প্রকাশ করিল। উঠিয়া বধূটির পায়ের কাছে আসিয়া তাহার পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। বধূটি পিছু ফিরিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আর মায়া বাড়াসনে রাক্ষস!

একটির পর একটি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। বেবীর সেবাযত্নে ত্রুটি হইল না। দুইবেলা মাংস রাঁধিয়া তাহাকে দেওয়া হইত। প্রতিদিন সকালে চা ও বিস্কুট সংযোগে সে জলযোগ করিত। তাহার নানা রকমের জামা তৈয়ারী হইল। কিন্তু রমার এই অক্লান্ত সেবা-যত্ন সত্ত্বেও বেবীর শরীর পুষ্ট হইল না, পরন্তু সে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল, তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কর্কশ হইল। রমার আপ্রাণ চেষ্টা আদৌ ফলপ্রসূ হইল না। সে একদিন স্বামীকে কহিল, কুকুরটা দিন দিন কেন জানি না শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু ডাক্তার-বদ্যি দেখাও না। শুনেছি কুকুরের নাকি ডাক্তার আছে।

স্বামী কহিল, কুকুর পোষার যদি অত শখ তা হলে এক কাজ কর না।

—কি?

—ওটাকে দূর করে দাও। আমি একটা ভাল বিলিতি কুকুর এনে দিচ্ছি। সেটা মানুষ কর।

রমা অভিমান করিয়া কহিল, তার মানে তোমরা সবাই ওর শত্রু। স্বাস্থ্য কি সকলের সমান হয়?

—কিন্তু ওর স্বাস্থ্য বদলাবে না কোন দিন রমা। ওর জাতটা মনে রেখো।

—ছেলে যদি কুৎসিত কুরূপ হয় কোন মা-বাপ তাকে প্রাণ ধরে দূর করে দিতে পারে গো?

তাহার এই চরম আঘাত পাইয়াও স্বামী হো হো করিয়া হাসিল, বলিল, তার চেয়ে একটা ছেলে মানুষ কর না কেন? কত গরীব ছেলে পাওয়া যাবে।

—তারা বড় নেমকহারাম হয়।

—কিন্তু রমা, ও কুকুর তোমায় ত্যাগ করতেই হবে!

—কারণ?

—কারণ, ওর রোগটি সোজা নয়, ওর গায়ের ঘা বড় বিচ্ছিরি আর ছোঁয়াচে। কখনও সারে না।

স্বামী ভাবিয়াছিল স্ত্রী নিশ্চয়ই ভয় পাইয়া যাইবে, কিন্তু স্ত্রী ভয় পায় নাই। বরং সে নির্ভীকভাবে বেবীকে তাহার বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে বলিয়াছে, বেবী, বেবী, সব্বাই তোর শত্তুর।

কি জানি কেন বেবীর চোখ দুটি চিক্ চিক্ করিয়া উঠিয়াছিল। রমা আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছিয়া দিতে দিতে কহিল, বেবী, দুষ্টু, কাঁদছিস্? দূর পাগল, আমি তোকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

কিন্তু এই ঘটনার দিন সাতেক পর বেবীই রমাকে ছাড়িয়া গেল। স্বামী যাহা বলিয়াছিল তাহাই সত্য হইল। বেবী পুরুষানুক্রমে যে দুরারোগ্য ও মারাত্মক রোগ পাইয়াছিল তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে নিষ্কৃতি পাইল না। রমা ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইতে ত্রুটি করে নাই। সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে, এই একটা হীনজাত কুকুরকে এই আপ্রাণ সেবা করিতে দেখিয়া।

শাশুড়ী কহিলেন, পয়সা খোলামকুচির মত উড়ে গেল দিদি। কুকুরটাকে নিয়ে হারামজাদী পাগল হয়েছে একেবারে। এই বিচ্ছিরি রোগ, অত মাখামাখি কি ভাল? এতে কি এমন বাহাদুরী আছে?

দিদি কহিলেন, ছেলেপিলে নেই কি-না, তাই একটা টান পড়ে গেছে।

শাশুড়ী বলিলেন, ছেলেপিলে হবার বয়স যেন কেটে গেছে! এই তো সবে ছাব্বিশ বছর বয়স। আমার তো দিদা হয়েছিল একুশ বছরে।

—একটা কিছু নিয়ে ত থাকতে হবে?

—তাই বলে এতটা বাড়াবাড়ি ভাল কি দিদি?

দিদি শাশুড়ীকে সাবধান করিয়া দিলেন, ছেলেকে তোমার তাই অত মিশতে দিও না।

শাশুড়ী কহিলেন, ছেলে ত আর পাগল নয়।

বেবীর জীবনের শেষ কয়দিন শাশুড়ী তাহাকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, বধূটির স্বামীও এ আদেশের প্রতিধ্বনি করিল। অগত্যা বেবী বাহিরের উঠানে স্থান পাইল। রাত্রে একটা প্যাকিং বাক্সে তাহার শয্যা রচনা করা হইত। রমা নিজের হাতে রাত্রে তাহাকে খাওয়াইত। খাওয়া শেষ হইলে তাহাকে বাক্সের মধ্যে পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইতে যাইত। ইদানীং তাহার মুখে বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল। তাহার

যেন অতি আপনার জনটির জীবনান্তের সম্ভাবনা। সন্তানের রোগশয্যাপার্শ্বে সেবাব্রতা মাতার মুখখানিও বুঝি এইরূপেই উদাস হইয়া থাকে। তাহার বক্ষিশ নাড়ী এমন করিয়াই বার বার মোচড়াইয়া উঠে। রমার স্বামী কহিল, কুকুর-কুকুর করে তুমি খেপলে নাকি!

রমা কুকুরের ক্ষত পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল, সত্যি বেবী বাঁচবে না?

তাহার বিষাদ-কাতর চোখ দুটির পানে তাকাইয়া স্বামী বেদনা বোধ করিল, স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ওর চেয়ে ভাল কুকুর এনে দেব রমা। যত দাম লাগে দেওয়া যাবে।

রমা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেবীর গা মুছিতে মুছিতে বলিল, আহা, বাছার আমার সব হাড় কখানা বেরিয়ে গেছে।

ইহার দুই দিন পরই বেবীর ইহলীলা সাঙ্গ হইল। সকালে রমা তাহার কাঠের ঘরের দরজা খুলিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বসিল। তাহার অত সাধের বেবীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। অসংখ্য লাল পিপীলিকায় সেই কদাকার, হাড়-বার করা রোমা-ওঠা দেহটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। রমা সেই বাক্সের উপর উবু হইয়া পড়িয়া আর্তকণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল, ওগো, আমি কাকে নিয়ে থাকব গো?

বেণীগীর ফুলবাড়ী

মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটে রোজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ললিতবাবুর দেখা হইত।

আমি পিসিমার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পশ্চিমের শহরে তাহার পূর্বে কখনও বেড়াইবার অভিজ্ঞতা ছিল না, আমার এক বন্ধু আসিবার সময় বলিয়াছিল—ওখানে জুতায় কালি দেওয়ার কোন দরকার হবে না দেখো।

দেখিলাম, ব্যাপার তাই বটে। লাল ধূলা মাখিয়া জুতার যে দশা হয় পনেরো মিনিট রাস্তা চলিবার পরেই, তাহাতে জুতায় কালি দিবার উৎসাহ ক্রমে কমিয়া গেল। শহরের মধ্যে বা বাহিরে যে কোন জায়গাতেই যান, সর্বত্র ধূলা। ক্রমে বেড়াইবার উৎসাহও কমিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যার পরে গঙ্গার ধারেই দেখিলাম বেড়াইবার প্রকৃষ্ট স্থান। এদিক ওদিক বেড়াইয়া কষ্টহারিণীর ঘাটের সিঁড়ির উপর অনেক রাত পর্যন্ত একা বসিয়া থাকিতাম।

একদিন পাশে এক প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। কথায় কথায় আলাপ হইলে জানিলাম, তাঁহার নাম ললিতমোহন ঘোষাল, বাড়ী হুগলী জেলায়—ভবঘুরে লোক, আগে ছিলেন বর্দ্ধমান টাউনে, ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় পশ্চিমে আজ প্রায় দশ-বার বৎসর আসিয়া বাস করিতেছেন। ক্রমে ললিতবাবুর সহিত প্রত্যহ দেখা হইত, ঘাটে বসিয়া গল্প করিতাম অনেক রাত পর্যন্ত।

একদিন তিনি আসিয়া আমায় বলিলেন—আপনি একজন সাহিত্যিক, এ কথা তো এতদিন আমায় বলেন নি?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কার মুখে শুনলেন আবার এ কথা ?

—সবাই বলছে। আপনি সোমবার বেথুনবাজার লাইব্রেরীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন শুনলাম। আমার বাড়ীওয়ালার ছেলে ছিল সভায়—

—হ্যাঁ, ও !…তা বটে।

—বড় আনন্দ হলো আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। আমিও নিজে একটু আধটু লিখতুম কিনা এক সময়ে, তাই সাহিত্যিকদের বড় শ্রদ্ধা করি মশায়—আপনি বয়সে অনেক ছোট হলেও আমার নমস্য—

আমি বিনয়সূচক হাস্য সহকারে বলিলাম—কি যে বলেন !

—একদিন আসুন না গরীবের বাসায়। লেখাটেখাগুলো আপনাকে দেখাব। এককালে যথেষ্ট—হেঁ হেঁ—লোকে জানতো। আমার উপন্যাসের দু-তিনটে এডিশন হয়েছে—মশাই—

শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। বাংলা আমি তখনকার সময়ের হেন উপন্যাস ছিল না যাহা পড়ি নাই। কিন্তু ললিত ঘোষালের নাম ঔপন্যাসিক হিসাবে কোথাও পাই নাই, কাহারও মুখে শুনিয়াছি বলিয়াও তো মনে হইল না।

কৌতূহলবশতঃ একদিন ললিতবাবুর সঙ্গে তাঁর বাসায় গেলাম। স্টেশনের কাছে লাইনের ধারে একটা ছোট পুরানো বাড়ীর বাহিরের ঘরে তাঁর বাসা। অতি অপরিষ্কার ঘর, কত কাল যেন ঝাঁট পড়ে নাই, বিছানাপত্র ততোধিক ময়লা, ছেঁড়া তুলো-বেরুনো ওয়াড়বিহীন বালিশ, ময়লা গামছা ও ঘরে পরিবার ধুতি দেখিয়া মনে হইল ললিতবাবুর বর্ত্তমান অবস্থা আদৌ স্বচ্ছল নয়। ললিতবাবু আমায় যত্ন করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, একটু চা খান দয়া করে এসেছেন যখন।

আতিথ্যের কোন ত্রুটি হইল না। নিজেই চা করিয়া দুখানা আটার রুটিতে গুড় মাখাইয়া আমায় খাইতে দিলেন। হুঁকায় তামাক সাজিয়া আমায় দিতে গেলেন, আমার ও-সব চলে না শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

নিজে তামাক খাওয়া শেষ করিয়া তিনি একখানা পুরানো বাঁধানো খাতা আমার কাছে আনিয়া খুলিলেন। আমার দিকে সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—এই দেখুন, মানে—যত কাগজে আমার সমালোচনা বার হয়েছিল আপনাকে দেখাচ্ছি। সাগ্রহে খাতাখানি দেখিতে লাগিলাম। এখন হইতে বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১০ কি ১২ সালের দিকে যে সব খবরের কাগজে ও মাসিক পত্রিকায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যেমন 'বঙ্গবাসী', 'ইংলিশম্যান', 'হিতবাদী' 'ভারত-মহিলা' প্রভৃতি—সেই সব পত্রিকা হইতে তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকের সমালোচনা-গুলি কাটিয়া আঠা দিয়া খাতাখানিতে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক টুকরাতে কাগজের নাম ও মাস তারিখ কালো কালি দিয়া হাতে লেখা। টুকরাগুলি বিবর্ণ, হলদে ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু খুব বেশী ধূলাবালি পড়িয়া নাই তাহাদের উপর—দেখিয়া মনে হয় খাতাখানির প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় ও মাঝে মাঝে ঝাড়ামোছা করা হয়। ললিতবাবু প্রত্যেকটি আমায় পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন। দেখিলাম—তাঁহার বইয়ের এককালে বেশ ভাল

সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। পড়িতে পড়িতে গর্ব্বে ও আনন্দে তাঁহার মুখ চোখের ভাবই যেন বদলাইয়া গেল। একখানা ইংরাজী কাগজে তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ বলা হইয়াছে, তবে ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজী কাগজ—বলা বাহুল্য, তাহাদের যেমন জ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে, তেমনি জ্ঞান ললিত ঘোষাল সম্বন্ধে। উঠিব উঠিব করিতেছি এমন সময় ললিতবাবু বলিলেন, দুখানা বই লিখে রেখেছি, অনেকদিন হল। মশায় তো কলকাতায় থাকেন, পাবলিশারদের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ, বই দুখানার কিনারা করতে পারেন ?

প্রধানতঃ তাঁহারই আগ্রহে পড়িয়া সেদিন দুখানা ভারি মোটা খাতা আমাকে বাসায় বহন করিয়া আনিতে হইল।

আসিবার সময় ললিতবাবু বার বার বলিলেন, আমি যেন পাণ্ডুলিপি দুখানা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখি। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া খাতা দুখানা পড়িয়া ললিতবাবুর জন্ম আমার কষ্ট হইল। অত্যন্ত সেকেলে ধরণের লেখা, জবড়জঙ্ ভাষা, সেণ্টেন্সগুলি কাঠের পুতুলের ন্যায় নড়নচড়ন-বিরহিত, প্রাণহীন। পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে পুণ্যের জয় ও পাপের শাস্তি পাঠকের চোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইয়াছে। এ যুগে এ বই অচল। ললিত ঘোষালকে কথাটা খোলাখুলিভাবে বলিতে পারি নাই। কষ্টহারিণীর ঘাটে ললিতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—পড়েছেন ? কেমন লাগল ?

বলিলাম—চমৎকার। একালে অমন লেখা আর দেখা যায় না।

কথাটার মধ্যে মিথ্যা ছিল না।

ললিতবাবু অত্যধিক খুশী হইয়া বলিলেন—হেঁ হেঁ, আপনি হলেন গিয়ে নিজে একজন লেখক—সমঝদার লোক। আপনাকে কি বুঝিয়ে বলতে হবে এসব ? আজকাল লেখা বদলে গিয়েছে মশাই—লিখতে জানেই না। বঙ্কিম, হেমবাবু, নবীন সেন—কি সব মহামহারথী বলুন দিকি একবার ? তা নয় রবিঠাকুর, রবিঠাকুর—হেঃ—

ললিতবাবু তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির ভঙ্গিতে অন্যদিকে ঘাড় ফিরাইলেন।

আমি সমর্থনসূচক মাথা নাড়িলাম। ললিতবাবুর উপন্যাস দুখানির প্রশংসা করিয়া যে ভাল কাজ করি নাই, পরে তাহা বুঝিয়াছিলাম। দিন নাই রাত নাই ললিতবাবু তাগিদ দিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন যে, উপন্যাস দুখানির কি কিনারা করিলাম। এমন কি, সন্ধ্যাবেলায় কষ্টহারিণীর ঘাটে বেড়ানো প্রায় ছাড়িয়া দিতে হইল।

পাঁচ ছয় দিন ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। একদিন আমার বাসার চাকর বলিল—আপনাকে এক আওরৎ খুঁজছে বাইরে—

আওরৎ কে খুঁজিবে ? বাহির হইয়া দেখি একটি সুন্দরী যুবতী সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত বাসার উঠানের পেঁপে-তলায় দাঁড়াইয়া আছে।

সবিস্ময়ে বলিলাম—কে ?

মেয়েটি চোখ নীচু করিয়া দেহাতি হিন্দীতে বলিল—লোলিতবাবু আপনাকে একবার ডেকেচেন বাবুজী—

—ললিতবাবু? বেশ যাব ও-বেলা।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

ভাবিলাম, মেয়েটি কে। ললিতবাবুর ঝি নাকি? কখনও সেখানে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। বেশ দেখিতে মেয়েটি। এ দেশের হিন্দুস্থানী মেয়েরা সচরাচর যেমন আঁটসাঁট গড়নের হয়, তেমন তো বটেই, ফর্সা, ধপ্‌ধপে রং, মুখশ্রীও বেশ লালিত্যপূর্ণ।

সন্ধ্যাবেলায় ললিতবাবুর বাসায় গেলাম। ললিতবাবু উনুনে কড়া চাপাইয়া চায়ের জল গরম করিতেছিলেন। জল নামাইয়া দুধ ও ভেলিগুড় মিশাইয়া চা তৈরী করিয়া আমায় খাইতে দিলেন। আমি বলিলাম—একটি মেয়ে গিয়ে আমায় আপনার এখানে আসতে বল্লে। কদিন ব্যস্ত ছিলাম বলে আসতে পারি নি—

ললিতবাবু বলিলেন—ও মণিয়া গিয়েছিল বুঝি? তা এসেছেন ভালই করেছেন। আমি ভাবছিলাম, কেন আর আসেন না।

স্বল্পমাত্র ভূমিকার পর ললিতবাবু আবার বইয়ের কথা পাড়িলেন।

—জানেন ব্যাপারটা, হাতে একটু টাকার ইয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম বই দুখানায় একখানাও যদি লাগিয়ে দিতে পারেন তবে এ সময়ে কিছু পেলে বড় উপকার হত। তাই মণিয়াকে ওবেলা আপনার ঠিকানা দিয়ে—তা করেছেন কিছু?

বড় বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি। ও বইয়ের আমি কি করিয়া কি করিব বুঝিলাম না। সেকথা ললিতবাবুকে বলিতে কিন্তু আমার মন সরিল না, কেন কি জানি!

বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। দু-তিনজন পাবলিশারকে লিখেছি, এখনও উত্তর পাইনি—পেলেই জানাব আপনাকে।

ললিতবাবু বলিলেন—আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। মণিয়া যখন বাড়ী চিনে গেছে, ওই পরশু সাগাৎ আর একবার যাবে এখন—

—মণিয়া বুঝি আপনার এখানে কাজ করে?

ললিতবাবু যেন ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—হ্যাঁ—ইয়ে—মণিয়া?…হ্যাঁ—

আমি সেদিন বিদায় লইয়া আসিলাম। তৃতীয় দিন মণিয়া আমার বাসায় আবার গিয়া হাজির। এদিন আমার কৌতূহল হওয়াতে মণিয়াকে বলিলাম—ললিতবাবুর ওখানে কতদিন আছিস?

মণিয়া বেশী কথা বলে না, মুখ না তুলিয়া কি একটা বলিল ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তাহার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলাম—ললিতবাবুকে গিয়ে বলো কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে—

মণিয়া টাকা কয়টি লইয়া চলিয়া গেল। ইহার পর দিনকতক ললিতবাবু আমাকে বড় উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কোন্ পাবলিশার তাঁর বই লইতেছে—কি কথা হইতেছে তাঁহাদের সঙ্গে ইত্যাদি। বই পড়িয়া রহিয়াছে আমার বাসায়। কলিকাতায় বইওয়ালারা এত বোকা নয় যে, ওই বইয়ের জন্য অগ্রিম টাকা দিতে যাইবে। মুখে বলিলাম—বই নেবে কি না তার

ঠিক নেই তবে যদি নেয় তার বায়নাস্বরূপ টাকাটা দিয়েছে।

ললিতবাবু বুঝিলেন না যে, আমার কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বায়না করা ইহাকে বলে না, বা এ অবস্থায় কেহ বায়নার টাকাও দেয় না। অভাবের দিনে টাকা আসিয়াছে তাহাই যথেষ্ট, কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল অত বুঝিয়া দেখিবার অবসর ও ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। সেই হইতে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দু এক টাকা পাঠাইয়া দিতাম ম'ণিয়ার হাতে, কারণ মণিয়াকে বাঁধা নিয়মে প্রতি সপ্তাহে আমার বাসায় পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন।

কষ্টই হইত তাঁহার কথা ভাবিয়া! প্রৌঢ় হইলেও ললিতবাবু দেখিতে সুপুরুষ, ভাল হোক মন্দ হোক তিনিও একজন লেখক ছিলেন, আজ অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তিন কূলেও এদিকে কেহ নাই। এই দূর বিদেশে এই বয়সে কে তাঁহাকে দেখে, কে মুখের দিকে চায়? টাকা কোন্ প্রকাশক পাঠাইতেছে, একথা তিনি আমায় মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি কাল্পনিক পুস্তক-প্রকাশকের নাম করিতাম, তাহাদের কাল্পনিক চিঠির কথা বলিতাম, কোন রকমে সেকথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িতাম।

শীতের শেষে সেবার মুঙ্গের হইতে চলিয়া আসিলাম।

আসিবার পূর্ব্বে ললিতবাবুর খাতা দুখানি তাঁহাকে ফেরত দিতে গেলাম। তিনি বলিলেন —কি হল মশায়?

—বড্ড গোলমাল হয়ে গেল সব। ওদের সে দোকানখানা উঠে গেল। তাইতে তাইতে গোলযোগ, কেস্ রুজু হয়েছে. এ অবস্থায় আর ওরা—তাই পরন্ত আমায় খাতা ফেরত পাঠিয়েছে।

পুনরায় ঘটনাচক্রে মুঙ্গেরে গেলাম তিন বৎসর পরে।

গিয়াই সর্ব্বপ্রথমে ললিতবাবুর কথা মনে হইল; কষ্টহারিণীর ঘাটে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করিলাম, ললিতবাবু মুঙ্গেরে আছেন না অন্যত্র চলিয়া গেছেন; কিন্তু বিশেষ কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

একদিন শহরের বাহিরে টমটম ভাড়া করিয়া বেড়াইতে গিয়াছি, পথে শহর হইতে অন্ততঃ ছ-সাত মাইল দূরে একটা বড় বাগানবাড়ী দেখিয়া টমটমওয়ালাকে বলিলাম—এ কার বাগান-বাড়ী রে? টমটমওয়ালা ভাল বাংলা বলে। আমার কথার উত্তরে সে বলিল—ই বেণীগীর ফুলবাড়ী আছে। শুনিয়াই বাগানটা দেখিবার শখ হইল।

—দেখতে দেয়?

—হাঁ বাবুজি, হঁহা এক বাঙ্গালী বাবু আছে—দেখনে কাহে নেই দেবে?

আমার আগ্রহ আরও বাড়িল বাঙ্গালী বাবুর নাম শুনিয়া। টমটম গেটের সামনে দাঁড় করাইয়া বাগানের ভিতর গেলাম। অদ্ভুত বাগান। দেখিয়াই বুঝিলাম—এককালে খুব বড় ও শৌখিন বাগানবাড়ী ছিল, বর্ত্তমানে সে অবস্থা নাই, কিন্তু বনে জঙ্গলে সমাকীর্ণ এই পরিত্যক্ত

বাগানবাড়ীর বন্য সৌন্দর্য্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

গেট হইতে কাঁকর বিছানো পথটি বাঁকিয়া চলিয়াছে—গাছপালার আড়ালে যে ভাঙ্গা পুরাতন বাড়ীর চুন-বালি-খসা শ্রীহীন, জীর্ণ রূপ দেখা যাইতেছে সেদিকে। বাগানের সর্ব্বত্র খুব বড় বড় বৃদ্ধ গাছ—প্রধানতঃ বট, অশ্বত্থ, নিম, মেহগ্নি, কৃষ্ণচূড়া, ছাতিম ইত্যাদি। গাছগুলির তলায় ঘন ফার্ণ ও কাঁটাজঙ্গল, এখানে ওখানে জংলী গোলাপের ঝোপ, কালো পাথরের হাতীর মুখ, মকর-মুখের পয়ঃনালী, হাতল-ভাঙ্গা লোহার বেঞ্চি, চটা ওঠা ঠেস্ গাঁথা চাতাল, জঙ্গলের নীচে লতায় পাতায় কাঠবেড়ালীর লঘুপদে ত্রস্ত যাওয়া-আসা, বনটিয়ার ডাক বড় বড় গাছের পাতার ফাঁক দিয়া সূর্য্যালোক আসিয়া পড়িয়াছে, একটা পাথরে গাঁথা শুকনো ফোয়ারার ধারে ঘন চামেলির ঝোপ, চামেলি ফুলের মিষ্টি সুবাস, প্রাচীন বটগাছে ডাহুক পাখীর ডাক, আর পায়ের নীচের আধশুকনো লম্বা লম্বা উলুঘাসের মধ্যে বহুরূপীর গতিবিধির খড়মড় শব্দ···সবটা মিলাইয়া একটা নিবিড় শান্তি ও নীরবতা।

কোন বড় লোকের বাগান ছিল এক সময়, বোধ হয় অবস্থা খারাপ হইবার জন্য আর বাগান দেখাশোনা করিবার শখ নাই। ফোয়ারার কাছে দাঁড়াইয়া এইসব দেখিতে দেখিতে ঐশ্বর্য্যের নশ্বরতা লইয়া বেশ একটা গম্ভীর ধরণের প্রবন্ধ (যাহাতে মানুষের ও সমাজের সত্যকার উপকার হয়, হালকা গল্প বা উপন্যাস লিখিয়া লাভ কি ?) রচনা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

আমার সামনের কাঁকরের পথ দিয়া আসিতেছেন কষ্টহারিণী ঘাটের সেই লেখক ললিত ঘোষাল্।

আমি বলিলাম—ললিতবাবু যে! এখানে কি রকম ? চিনতে পারেন ?

ললিতবাবু চিনিতে পারিলেন। আমায় দেখিয়া খুব খুশী হইলেন। আমায় জোর করিয়া বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। আজ এখানে থাকিতে হইবে, কোন অসুবিধা নাই। কতকালের পর দেখা, অনেক কথা আছে, ইত্যাদি।

বাড়ীটা খুবই পুরানো, সামনে খুব বড় রোয়াক বা চাতাল, সেখানে আমরা পাথরের বেঞ্চিতে গিয়া বসিলাম। ললিতবাবুকে বলিলাম—তার পর ? আপনাকে কত খুঁজেছি—মুঙ্গের শহরে আজ দিন পনেরো এসেছি। এখানে গড্ফরসেকন জায়গায় কি করে এসে পড়লেন ? কিনেছেন নাকি ? এখানে আর থাকে কে ?

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—আরে, ব্যস্ত হবেন না। সবই দেখতে পাবেন। আপাততঃ একটু চা খান—দাঁড়ান বলে আসি—

ললিতবাবু কাহাকে চায়ের জন্য বলিয়া আসিলেন তখন বুঝি নাই, কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যে ত্রীড়াবনতা সুন্দরী হিন্দুস্থানী মেয়েটি চা ও পাঁপর ভাজা আনিয়া আমাদের সামনে রাখিল, তাহাকে দেখিয়া চিনিলাম। ললিতবাবু বলিলেন—চিনেছেন একে ?

—হ্যাঁ, ও তো সেই মণিয়া! ও তা হলে এখনও আপনার কাছেই কাজ করে ? কথাটা শুনিয়া ললিতবাবু হাসিলেন, মণিয়ার মুখেও সলজ্জ হাসির রেখা ফুটিল। সে অন্যদিকে মুখ

ফিরাইল। ব্যাপার কি? আমার কথার মধ্যে হাসিবার কি আছে ভাবিয়া পাইলাম না।

ললিতবাবু বলিলেন—মণিয়া, যাও, আর একটু চা দাও আমাদের—

মণিয়া চলিয়া গেলে ললিতবাবু আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কে কার কাজ করে মশাই? মণিয়াকে আপনি ভাল করে কোনদিন জানেন না। এই ফুলবাড়ী ওর নিজের। আমি ওর আশ্রয়ে আছি। এটা ওর বাপের বাড়ী।

মণিয়াকে ললিতবাবুর ঝি বলিয়াই জানিতাম, কখনও আমার মনে আসে নাই যে, সে ছদ্মবেশিনী রাজকুমারী, সুতরাং কথাটা শুনিয়া তো দস্তুরমত আশ্চর্য্য হইলাম। বলিলাম—মুঙ্গেরে যখন থাকতেন আপনি, তখন মণিয়া তো আপনার বাসায় কাজ করত—

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—কখনও আমার বাসায় কাজ করতে ওকে দেখেছিলেন? আন্দাজ করেছিলেন আপনাকে ডেকে আনত বলে। আসল কথা জানতেন না।

—আসল কথাটা কি তাড়াতাড়ি বলুন, রহস্যটা কোথায়?

—মণিয়ার বাবার সঙ্গে ওর মায়ের বিয়ে হয় নি। ওর বাবা মস্ত ধনী জমিদার ছিলেন, ওর মা মজঃফরপুর জেলার এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের মেয়ে—এই বাগানবাড়ীতে এনে ওর বাবা তাকে তাঁর কাছে রাখেন। মণিয়া ওদের একমাত্র সন্তান—এখন দুজনেই পরলোকগত, মণিয়া এই বাগানবাড়ীর মালিক। বুঝলেন কিছু? খুব সোজা কথা।

—খুব সোজা কথা নয়। মণিয়ার সঙ্গে আপনার কি ভাবে আলাপ, আপনিই বা এখানে থাকেন কেন, মণিয়ার অভিভাবকই বা কে ছিল—এসব কথা খুব সোজা আর কই?

ললিতবাবু বলিলেন—সে আরও সোজা কথা। আমি মণিয়ার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলাম, তাঁর মৃত্যুর পরে আমিই এখন মণিয়ার অভিভাবক। আর একজন আছি আছেন মুঙ্গেরের উকিল বাবু কমলেশ্বরী সহায়। মধ্যে আমাকে ওরা সবাই ষড়যন্ত্র করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাই মুঙ্গেরে গিয়ে বছরখানেক ছিলুম। মণিয়া প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে যেত। আপনার কাছে ওকে পাঠাতুম বইয়ের দরুন টাকা আনতে। ও নিজেও অনেক সাহায্য করেছে—

বলিলাম—ওর বিয়ে হয়নি?

ললিতবাবু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ওর এই ইতিহাস শুনে কে ওকে বিয়ে করবে বলুন। বিশেষত, এ দেশ তো জানেন?

ইতিমধ্যে সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বেলা আর বেশী নাই, চামেলি বনের ধারে পাথরের বেঞ্চিতে বসিয়া আমাদের গল্প জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় মণিয়া আবার চা আনিল।

ললিতবাবু বলিলেন—মণিয়া, এ বাবুকে চিনতে পেরেছ?

মণিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

—কোথায় দেখেছিলে বল তো?

—মুঙ্গেরে। ওঁর বাসায়।

পরে আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে ওর অত্যন্ত দেহাতি হিন্দীতে বলিল—ভাল আছেন বাবুজী ?

—হাঁ। তুমি ভাল আছ মণিয়া ?

এই সময় ললিতবাবু বলিলেন—রাত্রে কিন্তু থাকতে হবে আপনাকে। আমি দুটো কথা বলবার লোক পাইনে, এসেছেন যদি থাকুন। মণিয়া তুমিও থাকতে বল।

—আমিও তো বলছি, থাকুন বাবুজী। ভারী খুশী হব থাকলে।

অগত্যা রাজী হইতে হইল।

দেখিলাম মণিয়া সত্যই খুশী হইল। বলিল—রাত্রে আপনি কি খান বাবুজী ? উনি পুরি খান—আপনিও তাই খাবেন তো ?

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মণিয়া সত্যই সুন্দরী মেয়ে। হিন্দুস্থানী মেয়ের দেহের গড়ন ও বাঙ্গালী মেয়ের মুখের লাবণ্য, এ দুটির অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে মণিয়াতে। দেহবর্ণ চম্পক গৌর, কাশ্মিরী মেয়ের মত ঈষৎ গোলাপী। মাথায় ঘন কালো এক ঢাল চুল। বড় বড় চোখ। আমার আশ্বাস পাইয়া মণিয়া উৎসাহের সহিত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল—সম্ভবতঃ রান্নাবান্না করিতে গেল।

ললিতবাবু বলিলেন—বড্ড সেবাযত্ন করে আমাকে—মানে খুব। তা মানবে না ? আমাদের সঙ্গে ওদের কথা ? কত কান্নাকাটি করে আমায় আনল।

রাত্রে চমৎকার চাঁদ উঠিল। জ্যোৎস্নার আলো বেণীগীর ফুলবাড়ীর প্রাচীন বট, মেহগ্নি ও পাইন গাছের ডালে পড়িয়া সমস্ত উদ্যানটিকে যেন এক রহস্যময় পুরানো দিনের জগতে পরিণত করিল। আমার মনে পড়িল দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার কথা—মণিয়ার বাবা ও মা—তাঁরা সমাজ সংসারকে তুচ্ছ করিয়া এই নিভৃত নিরালা বাগানে পরস্পরের প্রণয়কে মাত্র সম্বল করিয়া জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন।

মণিয়া আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল খাইবার জন্য। তখন রাত দশটার কম নয়। এই এত বড় বাড়ীর নিভৃত রান্নাঘরটিতে বসিয়া মেয়েটি এতগুলি রান্না রাঁধিয়াছে, এক চুপড়ি আটার পুরী ভাজিয়াছে—আগুনের তাতে সুন্দর মুখখানি রাঙা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম—দীর্ঘ কালো কেশপাশ অবিন্যস্ত—দেখিয়া তাহার উপর কেমন মমতা হইল।

মণিয়া কাছে বসিয়া আমাদের যত্ন করিয়া খাওয়াইল, নিজের হাতে ললিতবাবুকে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, মশলা সুপারী দিয়া গেল—হিন্দুস্থানীর দেশে পান খাওয়ার তেমন রেওয়াজ নাই।

ললিতবাবুর উপর হিংসা হইল—লোকটা তোফা তোয়াজে আছে। মণিয়ার মত মেয়ের সেবা যে দিনরাত পায়, তাহার উপর হিংসা হয় বৈকি। লোকটার বরাত ভাল।

এইভাবে ললিতবাবুর সঙ্গে যে আলাপ-পরিচয়ের সূত্র পুনরায় স্থাপিত হইল, আমার এক বৎসরব্যাপী মুঙ্গের প্রবাসের মধ্যে সেই সূত্র ধরিয়া অনেকদিন বেণীগীর ফুলবাড়ীতে গিয়াছি।

বার দুই যাইবার পরে আমার কৌতূহল বড় বাড়িল। হয়তো আমার সে কৌতূহল

অযথা ধরনের, তবুও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কৌতূহল শুধু এই বিষয়ে যে, মণিয়া ও ললিতবাবুর মধ্যে সম্পর্কটি কি। ললিতবাবুর বয়স বাহান্ন হইতে পারে, সাতান্ন হইতে পারে, ষাট বলিলেও দোষ ধরিতে পারা যায় না। মণিয়ার বয়স খুব বেশী হইলেও চব্বিশের বেশী কখনও নয়।

পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক। ছাত্রী-শিক্ষকের সম্পর্ক। অভাবপক্ষে ভাই বোনের সম্পর্ক। বয়স হিসাবে তাই হওয়া উচিত এবং হইলে দেখাইত খুব ভাল, মানিয়া লইতাম। কিন্তু জগতে যাহা ভাল দেখায়, যাহা হওয়া উচিত, তাহা সব সময় ঘটে না ইহাই দুঃখ।

একদিনের কথা বলি, কি করিয়া প্রথম আমার সন্দেহ হইল।

সেদিন ভয়ানক গরম, দারুন রোদের তাত, বেলা তিনটার সময় আমি গিয়াছি ওখানে, গিয়া দেখি মণিয়া ছাড়া আর কেহ নাই বাড়ীতে।

সে আমায় দেখিয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—বাবুজী, উনি কোথায় বেরিয়ে গিয়েছেন দুপুরের পরে, এক ঘন্টার মধ্যে ফিরবার কথা—এখনও ফিরলেন না, কি হবে?

জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, ললিতবাবু বালিশের জন্য শিমুল তুলা কিনিতে গিয়াছেন নিকট-বর্ত্তী কি একটা বস্তিতে। আমি যত মণিয়াকে বোঝাই, তাহার সে কি ব্যাকুলতা, কি উদ্বেগ, বার বার ঘরবাহির করার সে কি চঞ্চল ভঙ্গী! আমি সেদিন মণিয়াকে নতুন দৃষ্টি দিয়া দেখিলাম যেন। সেই একদিন দেখিয়াই আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম, মণিয়া ললিতবাবুকে ভালবাসে। পিতাপুত্রী নয়, ভাইবোন নয়। নায়িকার মত ভাল না বাসিলে ঠিক সে জিনিসটি হয় না—চোখে না দেখিলে কি করিয়া তাহা বুঝাইব!

তাহার পর ললিতবাবু একদিন আমাকে সামান্য একটু বলিলেন। কথায় কথায় মণিয়ার কথা উঠিলে আমায় বলিলেন—ও আমার মুখের দিকে চেয়ে ওর যৌবনের দিনগুলো কাটাল—কতবার ভাবি, আমার অবর্ত্তমানে ওর কি যে হবে! সমাজে ওর স্থান কোনদিনই নেই। আমায় ছাড়া ও কাউকে জানেও না। ভেবে কষ্ট হয় এক এক সময়!

একটি কুড়ি-একুশ বছরের তরুণী যে একজন পঞ্চান্ন বছরের (কম পক্ষে) বৃদ্ধকে নিবিড়-ভাবে ভালবাসিতে পারে, নিজের চক্ষে দেখার পূর্ব্বে সে কথা কেহ যদি বলিত, তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।

জীবনের কি রহস্যই বা আমরা জানি! মণিয়ার ভালবাসা দেখিয়া জীবনের একটি অজ্ঞাত তথ্য জানিয়া বিস্মিত হইলাম।

আরও একটি ব্যাপার দেখিলাম।

ললিতবাবু সম্পূর্ণ বেকার, একটি কানাকড়ি দিয়াও তিনি মণিয়াকে সাহায্য করিতে অক্ষম, অথচ তাঁহার যাহা কিছু খরচ সব যোগাইতে হয় মণিয়াকেই এবং সে অম্লান বদনে তাহা এযাবৎ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। ললিতবাবু তাঁহার স্বগ্রামস্থ এক বেকার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাসিক অর্থসাহায্য করেন (চার পাঁচ বার ললিতবাবু আমাকেই টাকাটা দিয়াছিলেন মনিঅর্ডার করিবার জন্য, কারণ তাঁহাদের এখানে নিকটে ডাকঘর নাই), তাহাও মণিয়ার পয়সায়। ললিতবাবু যখন একা মুঙ্গেরের বাসায় থাকিতেন, তখনকার অপেক্ষা এখন তাঁহার চাল অনেক

বাড়িয়াছে। পরের পয়সায় আমাদেরও বাড়িত। কথাবার্তার মধ্যে একদিন ললিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মণিয়ার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন কতদিন? কি ভাবে আলাপ হয়?

—শুনবেন? কলকাতায় যখন বইটই আর কেউ নিতে চায় না, পাবলিশার খুঁজে পাইনে, তখন তো এলাম মুঙ্গেরে, আজ থেকে বছর বারো আগে। বাবু কমলেশ্বরী সহায় এখানকার বড় উকিল, তিনি বল্লেন, একজন বড়লোক মক্কেল বাঙ্গালী সেক্রেটারী খুঁজছে, ইংরিজি চিঠিপত্র লেখার জন্যে—তাই এখানে এসে মণিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করি; চাকুরিও হয়ে গেল—সাত বছর ছিলাম। মণিয়ার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে গিয়ে মুঙ্গেরে বাসা করে থাকতাম, সে অবস্থায় আপনি আমায় দেখেছিলেন সেবার। মণিয়া জোর করে আবার নিয়ে এল এখানে। কি করি বলুন?

সত্যই তো। বেচারী ললিতবাবু! কি করিবার ছিল তাঁর? মণিয়াকেও দেখিয়াছি, ললিতবাবুকে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে। তাঁহার এতটুকু কষ্ট বা অসুবিধা—বাস্তব বা কাল্পনিক, দূর করিতে কি ব্যাকুলতা! নিজের চোখে যাহা দেখিতে পাই তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারি কই? মাস কয়েক যাতায়াতের ফলে ক্রমে আমার মনে হইল যে, মণিয়া যতটা করে, ললিতবাবুর দিক হইতে তাহার অর্দ্ধেকও নাই, বরং আরও কম। ললিতবাবু এখানে আছেন যে, তাহার কারণ মণিয়ার উপর তাঁহার দরদ নয়, তিনি বর্ত্তমানে বেকার, মণিয়া তাঁহার সব খরচ চালাইয়া থাকে—এইজন্য।

ললিতবাবু মণিয়াকে তাঁহার ঝি বা পাচিকার মত ভাবেন যেন, হুকুমের উপর তাকে সর্ব্বদা রাখিয়াছেন। অনেক সময় ভাবটা এই রকম দেখান যে, তিনি অতি বড় লোক বাঙ্গালী, এখানে যে অবস্থান করিতেছেন সে নিতান্তই মণিয়ার উপর কৃপা করিয়া।

বেণীশীর ফুলবাড়ীর প্রাচীন বনস্পতিদের ছায়ায় চামেলি ঝোপের ধারের হাতল-ভাঙা লোহার বেঞ্চিতে বা পুকুরের ভাঙা ঘাটে বসিয়া কতদিন তরুণী মণিয়ার জীবনের এ অদ্ভুত ট্রাজেডির কথা চিন্তা করিয়াছি।

জগতে কেন এমন ঘটে, অমন সুন্দরী মেয়ে—কত তরুণ প্রেমিক যাহার এক কণা অনুগ্রহ পাইবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে রাজী হইতে পারিত—তাহার অদৃষ্টে একি দুর্ভোগ!

একদিন এ অবস্থায় একা বসিয়া আছি, মণিয়াকে দূরে দেখিতে পাইয়া ডাকিলাম। এ সময়টা সে খানিকক্ষণ আপন মনে বাগানে বেড়ায় জানি।

মণিয়া কাছে আসিয়া বলিল—এখানে বসে কেন বাবুজী?

—বেশ বসে আছি। ললিতবাবু উঠেছেন?

—এখনও ওঠেন নি। উনি ঠিক চার বাজলে ওঠেন—তারপর চা করব।

ললিতবাবুর বৈকালিক নিদ্রা ঘড়ির কাঁটার মত বাঁধা পথ ধরিয়া চলে, নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম বড় একটা ঘটিতে দেখিলাম না।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে।...

মণিয়ার পরনে একখানা হাল্কা চাঁপা রঙের শাড়ী, গায়ে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত কোর্ত্তা, সুগঠিত গৌরবর্ণ বাহু দুটিতে বাজু, কানে বড় বড় কানবালা, কপালে কালো টিপ। রূপকথার রাজকুমারীর মত সম্পূর্ণ সেকেলে ধরনের বেশভূষা ওর, হালফ্যাশানের বড় একটা ধার ধারে না, দেহাতি মেয়ে, সম্ভবতঃ জানেও না।

বলিলাম, বসো মণিয়া—

—না বাবুজী, দাঁড়িয়ে আছি বেশ, সারাদিন তো বসে থাকি—

—তুমি আপন মনে বেড়াও এ সময়টা, না?

—হ্যাঁ বাবুজী, উনি ঘুমোন, আমার কাজকর্ম্ম থাকে না—একটু বেড়িয়ে বেড়াই—

—ঘুমোও না বুঝি?

—না, দুপুরে আমার ঘুম ভাল লাগে না। অভ্যেস নেই বাবুজী।

—আচ্ছা, এ বাগানে কতদিন আছ?

—ছেলেবেলা থেকেই। এই তো আমাদের বাড়ীঘর। বাবা মা ছিলেন যখন, তখন খুব ভাল ছিল—বাবার বাগানের শখ ছিল খুব। নিজের হাতে গাছ পুঁতেছিলেন কত। একটা বটগাছ আছে বাবার হাতে পোঁতা, তার পাতাগুলো জুড়ে ঠোঙার মত হয়ে যায়—নাকি কৃষ্ণজী দুধ খেতেন বলে বৃন্দাবনে যমুনার ধারে অমনি হত, বংশীবট বলে এদেশে। আসুন দেখবেন।

আমাকে সে পুকুরের ওপারে বাগানের দক্ষিণ কোণে লইয়া গেল। বনের মধ্যে একটা ছোট বটগাছ, তাহার কচি পাতা পরস্পর জোড়া লাগিয়া ঠিক যেন ঠোঙার মত। মণিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, দেখলেন? কি তাজ্জব বাবুজী? না?

বিস্মিত হইবার মত মুখ করিয়া বলিলাম, তাজ্জবই বটে, সত্যি—

মণিয়া হাত নাড়িয়া উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল—দেখুন কতকাল আগে কৃষ্ণজী দুধ খেতেন বলে এখনও পাতাগুলো ওর জোড়া লেগে যায়। এতেও লোকের অবিশ্বাস ঘোচে না—বলুন বাবুজী!

বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—ঠিক বলেছ মণিয়া—খুব ঠিক—

উহার সরল বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিবার আমি কে?

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাবা কতদিন মারা গিয়েছেন?

—ছ বছর বাবুজী।

—উনি মারা যাওয়ার পর কোথায় ছিলে?

—কোথাও না বাবুজী, এখানেই। আমার দাই-মা আর চাচেরা ভাই সঙ্গে থাকত।

—তা ওরা এখন কোথায়?

—উনি আসাতে চলে গিয়েছে। কি করি বাবু, মুঙ্গেরে বড় কষ্ট পেতেন উনি, বাবা এমন কিছু রেখে যান নি যে সেখানকার সব খরচ দিই। তবে এখানে থাকলে চলে যায় এক রকমে। ওঁর কষ্ট চোখে দেখে থাকতে পারলাম না, তাই নিয়ে এলাম।

—তোমার ভাই তাতে চটল বুঝি ?

—উঃ, ভারি রাগ তাতে, বলে বাংগালি বাবুকে কেন নিয়ে এলি তুই ? আমিও বলেছি —ওর আসা পছন্দ না কর চলে যাও ; আমার বাড়ী, আমি যা ভাল বুঝব করব। তাই চলে গেল। এখন উনি ছাড়া আর আমার কে আছে বাবুজী !

মণিয়ার চোখ দুটি ছলছল্ করিয়া উঠিল। মেয়েটি সত্যবাদিনী, তাহার স্পষ্ট সত্য কথা বলিবার সাহস দেখিয়া প্রীত হইলাম। অন্য কথা পাড়িবার জন্য বলিলাম—গান গাইতে পার মণিয়া ?

মণিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিল—বেশী কিছু না বাবুজী, বহুৎ একটু—

—গাইবে ! গাও না ?

মণিয়া কি বুঝিল জানি না, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া প্রতিবাদের সুরে বলিল—বাবুজী—

আমি মণিয়ার সহিত প্রেম করিতে চাহি নাই। মণিয়া আমাকে ভুল বুঝিয়া বসিল। সেভাবে কথাটা বলি নাই আমি। বলিলাম—এখন না হয়, সন্ধ্যের সময় করো। ললিতবাবু যদি বলেন—তাহলে গাইবে ?

অতিথির প্রতি উহার কর্তব্যবোধ ও ভদ্রতা বড়ঘরের ঘরানার উপযুক্ত বটে। কি সুন্দরী দেখাইতেছে মণিয়াকে ! উহাকে দেখিলেই আমার মনে হয় ও সেকালের মেয়ে, সেকালের বেশভূষায়, প্রাচীন উদ্যানের বনস্পতিদের পটভূমিতেই ওকে মানায়, অন্যত্র ও নিতান্ত খাপছাড়া।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, প্রাচীন বটের ডালে ডাহুক ডাকিতেছে, ললিতবাবুর ঘুম ভাঙিবার সময় হইল। বলিলাম—চলো মণিয়া, চারটে বাজে—

সন্ধ্যার পর ললিতবাবুকে বলিয়া মণিয়াকে গান গাওয়াইলাম। ওর এমনি খুব সুরেলা গলা, তবে বিহারী দেশওয়ালী গ্রাম্যসুরের গানই বেশী জানে। বেণীগীর ফুলবাড়ীতে বড় বড় গাছপালা, মেহগ্নি, কৃষ্ণচূড়া, চামেলির বন আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল গান শুনিতে শুনিতে—আমি যেন অতীত যুগের ভারতে ফিরিয়া গিয়াছি। বাণভট্ট কি শূদ্রক বা ওই ধরনের কোন কবির নায়িকা জীবন্ত হইয়া যেন আমার সামনে বসিয়া সুন্দর হাতটি নাড়িয়া বীণা বাজাইয়া অর্দ্ধমাগধী ভাষায় সঙ্গীত গাহিতেছে…

সেদিন জ্যোৎস্নারাত্রের আলোছায়ার মধ্যে মণিয়াকে দেখিয়া আমার মনে হইল, কবি বাণভট্ট সে যুগের ঠিক এমনি একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া তাঁহার কাব্যের মহাশ্বেতার কল্পনা করিয়া থাকিবেন—সমগ্র বৃদ্ধ পৃথিবীকে নবযৌবনের সাজে সাজাইবার মায়ামন্ত্র যে ইহাদের সুন্দর মুখের স্মিতহাস্য, ইহাদেরই পদ্মপলাশলোচনের অশ্রুজল। হয়তো তখন আমার বয়স কম ছিল বলিয়াই মণিয়াকে আমার অত ভাল লাগিয়াছিল। এখনও বিহার বা পশ্চিমের কথা মনে হইলেই আমার মনের চোখে ভাসিয়া ওঠে বেণীগীর ফুলবাড়ী, তার প্রাচীন গাছপালা, চামেলি বন ও রূপসী মণিয়া।

মাস খানেক পরে।

একদিন ললিতবাবু মুঙ্গেরে আমার বাসায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিলাম, আসুন, আসুন ললিতবাবু, কখন এলেন?

ললিতবাবু কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—এই এলাম মশাই। দেশে যাচ্ছি।

একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, দেশে?

—হ্যাঁ দেশে। ওখান থেকে চলে এলাম—

—চলে এলেন? তার মানে? মণিয়া কেমন আছে?

ললিতবাবু ঝাঁজের সহিত বলিলেন—ভালই আছে। আমার পোষালো না, চলে যাচ্ছি।

—ব্যাপার কি? হলো কি?

—হবে আর কি? আমি কারো হাত-তোলা খেয়ে থাকতে পারব না। হয়েছে কি, আমার বাড়ীতে একটা সাড়ে এগারো টাকার রেভিনিউ মণিঅর্ডার পাঠাতে হবে, আজ কদিন ধরে চাচ্ছি টাকাটা। কবার চাইব? আমার মান বলে একটা জিনিস আছে তো? আজ দেব, কাল দেব, আজ ওবেলা নিয়ে এসেছে পাঁচটি টাকা। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আরে, আমার বইয়ের এককালে তিন-তিনটে এডিশন হয়েছে, আমার টাকা চেনাতে হবে না। ওর মা মাগী ছিল ভ্রষ্টা, ওদের কি ভদ্রস্থতা আছে মশাই? ভদ্রলোকের খাতির কি বোঝে ছাতুখোর মেড়ুয়াবাদীর দল?

ললিতবাবুর মুখের এ কথার কিছুদূর পর্য্যন্ত আমি প্রণয়ীর অভিমান বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতাম হয়তো, কিন্তু তাঁহার উক্তির সবটা এভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার চরিত্র ও মেজাজের উপর আমার অশ্রদ্ধা হইয়া গেল। টাকার জন্য আমাকে পূর্ব্বে তিনি কি রকম উদ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, (কারণ তাঁহার পুস্তক প্রকাশের আসল উদ্দেশ্য সাহিত্য-প্রীতি নয়—টাকা, তাহা অনেক দিন বুঝিয়াছি) সে কথা মনে পড়িল।

আমি বলিলাম—হয়তো মণিয়ার কাছে নেই, এ হতে পারে।

—নেই তো কি মশাই, সাতটা টাকা আর নেই? এর আগেও বাড়ীতে টাকা পাঠাবার বেলা এরকম করেছে। তাছাড়া ঠিক সে কথাও নয়, আমার আর ভাল লাগছে না এ ছাতুখোরের দেশ। দেশে গিয়ে মানকচু আর নলেনগুড়ের পায়েস খেয়ে বাঁচি দিনকতক। রাঁধতে পারে কেউ এদেশে? যা রাঁধবে এক তরকারী, বেগুন বেগুনই এক তরকারী, পটল পটলই এক তরকারী—এ দেশে মানুষ আছে? রামোঃ—

বলিলাম—দেশে কে আছে আপনার?

—ভাইপো আছে, ভাইপোর স্ত্রী আছে, তাদের ছেলে-মেয়েরা আছে, নেই কে? তাদের ফেলে বিদেশে থাকা কি পোষায় এই বয়সে, বলুন তো? দেশে থাকলে অভাব কি আমার? এ ছাতুর দেশে আর না, ঢের হয়েছে, হাঁপিয়ে উঠেছে প্রাণ—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

মনে ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি, দেশে থাকিলে যদি চলিবার ভাবনা নাই, তবে ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে

প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর কি দরকার হইত ছাতুর দেশ হইতে? এবং তাও একটি ছাতুর দেশের সরলা মেয়ের নিকট হইতে ভুলাইয়া লওয়া টাকা?

নাঃ, লোকটা অকৃতজ্ঞের একশেষ। চলিয়া গেল দুপুরের ট্রেনে। আমি তুলিয়া দিতে পর্য্যন্ত গেলাম না। ঘৃণা হইল লোকটার প্রতি।

ললিতবাবু চলিয়া যাইবার দুদিন পরে আমার বাসার জানলার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখি মণিয়া বাসার সামনে টমটম হইতে নামিতেছে। আমি গিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া বসাইলাম। মণিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—বাবুজী, উনি কোথায় জানেন? আপনার এখানে এসেছিলেন? ওখান থেকে বেরিয়েছেন আজ দুদিন হল, সঙ্গে টাকাকড়ি আছে, উনি তো আপন-ভোলা মানুষ—আমার বড্ড ভয় হয়েছে—মুঙ্গের বড় খারাপ জায়গা বাবুজী—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—টাকাকড়ি কিসের?

—আমার হার ছড়াটা ভেঙে গড়াতে দেবেন বলে সঙ্গে আনলেন আর পঞ্চাশটা টাকা—ওঁর নিজের কি দরকার আছে বল্লেন; আর বাগানের বড় চাতালটা—যেখানে বসে আপনারা চা খান, ওটা মেরামত করবার জন্যে চুণ আর সিমেণ্ট কেনবার দরকার—তাই। কালই ফিরবার কথা ছিল, কিন্তু আজ সকালেও যখন এলেন না তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না—আপনার এখানে আসেন নি বাবুজী?

ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

কেন জানি না, মণিয়াকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিতে পারি নাই। অর্থনাশের দুঃখ হইতেও বড় দুঃখ আছে—এই সরলা দেহাতি তরুণীর মনে সে দুঃখ বড় বিষম বাজিত। হয়তো মণিয়ার প্রতি কোন ধরনের দুর্ব্বলতা ছিল আমার, তাই সে দুঃখের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইলাম।

—বলিলাম, ললিতবাবু ভাইপোর অসুখের খবর পেয়ে হঠাৎ দেশে চলে গিয়েছেন, আমার ঠিকানায় তার এসেছিল। টাকাটা সঙ্গে নিয়ে গেছেন, খরচপত্রের দরকার আছে বল্লেন। হারগাছটা তাড়াতাড়িতে দিতে পারেন নি, দেশের সেকরাকে যেবেন ভেঙে গড়াতে।

ইহার পর আমি বেশীদিন মুঙ্গেরে ছিলাম না; যে কদিন ছিলাম মণিয়া দুই সাত দিন অন্তর আসিয়া ললিতবাবুর কোন চিঠি আসিল কি না খবর লইত। বলা বাহুল্য, ললিতবাবু কোন চিঠি দেন নাই।

সেই মাঘ মাসে আমি মুঙ্গের হইতে চলিয়া আসিলাম এবং তাহার পর প্রায় পাঁচ বছর ওদিকে যাই নাই। বিগত ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পের পর পিসিমাদের দেখিতে আমি আবার মুঙ্গেরে যাই।

মুঙ্গেরে পদার্পণ করিয়াই শহরের চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে মুঙ্গের নাই—চারিদিকে ধ্বংসদেবের প্রলয় তাণ্ডবের পদচিহ্ন। অবশ্য ভূমিকম্পের পর তখন তিন চার মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন কি মনে করিয়া একখানি টমটম ভাড়া করিয়া বেণীগীর ফুলবাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

বেণীগীর ফুলবাড়ীতে মণিয়াদের সে জরাজীর্ণ বাড়ীটা ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, মণিয়াও বাঁচিয়া নাই, বাড়ী চাপা পড়িয়া হতভাগিনীর মৃত্যু হইয়াছে, বেণীগীর ফুলবাড়ীর প্রাচীন বট, মেহগ্নি, কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় মহাশ্বেতার বীণার ক্লান্ত সুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া চিরদিনের মত নীরব হইয়া গিয়াছে—ইহাই সেখানে নিশ্চয় দেখিব ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম।

কিন্তু তাহার বদলে যাহা দেখিলাম তাহার জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না।

ফুলবাড়ীর সামনে টমটম হইতে নামিলাম। ফটক দিয়া ঢুকিতেই গাছপালার ফাঁক দিয়া চোখে পড়িল, বাড়ীটা যেন মাটির উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। বাগানের ও বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া জনশূন্য বলিয়াও বোধ হইল না। আরও কিছু অগ্রসর হইয়া শুকনো ফোয়ারাটার ধারে চামেলি বনের কাছে যাইতেই কাছে একটি মেয়েকে গাছের ডালে বাঁধা তারের আলনায় কাপড় মেলিয়া দিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সেই সময় পায়ের শব্দে মেয়েটিও চমকিয়া আমার দিকে পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেখিলাম সে মণিয়া।

মণিয়ার চেহারার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একটু মোটা হইয়া গিয়াছে, মুখশ্রী বদলাইয়াছে, তবুও সে এখনও সুন্দরী।

বলিলাম— চিনতে পারো মণিয়া?

মণিয়ার ডাগর চোখ দুটিতে বিস্ময়ের দৃষ্টি তখনও কাটে নাই। আমার দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর উজ্জ্বল মুখে বলিল—বাবুজী? আসুন, আসুন, এতদিন কোথায় ছিলেন? সেই চলে গেলেন—আর খোঁজ নেই, খবর নেই, কত ভেবেছি আপনার জন্যে।

—এখানে ছিলামই না—দিন কয়েক হলো আবার এসেছি। যে কাণ্ড হয়েছে দেখলুম তোমাদের দেশে! তারপর তুমি ভাল আছ?

মণিয়া সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আপনার আশীর্ব্বাদে বাবুজী প্রাণে বেঁচে গিয়েচি সব! এ বাড়ীটার বিশেষ কিছু হয় নি—আসুন না, চলুন বাড়ীতে—

বলিলাম—বাড়ীতে তুমি, এখন—মানে আর কে আছে?

মণিয়া বলিল—আমার দাই-মা, আর চাচেরা ভাই আছে—পরে সলজ্জ হাসিয়া বলিল—আর উনি আছেন।

পরম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—কে? ললিতবাবু?

মণিয়া পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া চোখ নীচু করিয়া বলিল—আবার কে বাবুজী? সেই তো চলে গেলেন, দুবছর ছিলেন দেশে। আমার দাই-মা আর চাচেরা ভাই আবার এল। তিন বছরের মাথায় উনি ফিরলেন। মাগো, এমনি রোগা হয়ে গিয়েছেন! বাঙ্গলা মুলুকের জল-হাওয়া একদম নরম, ওঁর এতকাল পশ্চিমে বাস, সহ্য হবে কেন? হাতে পয়সা যা নিয়ে

গিয়েছিলেন, কবে উড়িয়ে বসে আছেন, আমার হার ছড়াটা পর্য্যন্ত—সে যাক্‌গে বাবুজী—ওঁর এই দাড়ি, চুল, ময়লা কাপড়, দশা দেখে তো কেঁদে বাঁচিনে। সেই থেকে আছেন। এখন বেশ শরীর সেরেছে। আর দেশে যাওয়ার নামটি মুখে আনতে দিইনে—

অবস্থা শুনিয়া মনে হইল, ললিতবাবুও বর্ত্তমানে সেকথা মুখে আনিবেন এমন কাঁচা লোক তিনি কখনই নহেন। বলিলাম—কোথায় উনি?

মনিয়া হাসিমুখে বলিল—চলুন, আসুন বাড়ীতে বাবুজী, ভারি ভাগ্যি আপনি এলেন! উনি খুব খুশী হবেন আপনাকে দেখে—এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি—চার বাজলেই উঠবেন—তারপর চা করব—আসুন।

প্রাচীন বটের ডালে পুরনো দিনের মত ডাহুক ডাকিতেছিল। বেণীগীর ফুলবাড়ী ঘুমন্ত স্বপ্নপুরী যেন, মণিয়া রাজকুমারী, ঘুম ভাঙ্গিয়া সদ্য উঠিয়াছে। সময় এখানে অচল।

ললিতবাবু লোকটার উপর পুনরায় ভয়ানক হিংসা হইল।